ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana® SAREES
Cotton Printed Sarees
Contact - 22188744/1386

স্বস্তিকা

দাম : ৪.০০ টাকা

আসবাব
বর্ধমান
(০৩৪২) ২৫৬৫৯৩১

৬৩ বর্ষ ১৪ সংখ্যা ।। ৪ পৌষ, ১৪১৭ সোমবার (যুগাব্দ - ৫১১২) ২০ ডিসেম্বর ২০১০ ।। Website : www.eswastika.com

গোধরা পরবর্তী দাঙ্গায় নির্দোষ মোদী, দোষী তিস্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি।। ২০০২ সালে সংঘটিত গোধরা পরবর্তী দাঙ্গায় গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কোনও ভূমিকা ছিল না বলে জানিয়ে তাঁকে নির্দোষ বলে রিপোর্ট পেশ করেছে সুপ্রিম কোর্ট নিযুক্ত স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টীম বা সিট। প্রসঙ্গত, কংগ্রেস সাংসদ হাসান জাফরি জাকিয়া-র স্ত্রী শ্রীমতী জাকিয়া ২০০২-এ গুজরাট দাঙ্গায় তাঁর স্বামীর মৃত্যুর জন্য নরেন্দ্র মোদী আর তার সহযোগীদের এনিয়ে দায়ী করলে দেশের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় গত ২৭ এপ্রিল বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করেন। সেই দলের সাম্প্রতিকতম রিপোর্টেই মোদীকে ক্লিনচিট দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে এই মামলাতেই জাল হলফনামা পেশ করে আদালতকে বিভ্রান্ত করার অভিযোগে তিস্তা শীতলাবাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় অপরাধ দণ্ডবিধির ১৯৩, ১৯৪, ১৯৫, ১৯৬, ১৯৯ এবং ২০০ ধারায় মামলা করার নির্দেশ দিয়েছেন আমেদাবাদের সেশন কোর্টের বিচারপতি এস এইচ ভোরা। তিস্তার মুম্বাই কেন্দ্রিক বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সিটিজেনস ফর জাস্টিস অ্যান্ড পিস এই গোধরা পরবর্তী দাঙ্গার মামলার সঙ্গে আগাগোড়াই যুক্ত ছিল। ওই সংস্থাটি থেকে পরবর্তীকালে বহিষ্কৃত ও একদা তিস্তা শীতলাবাদের ঘনিষ্ঠ সহযোগী রইস খান গত মাসে ভারতীয় অপরাধ দণ্ডবিধির ৩১১ ধারায় তিস্তার বিরুদ্ধে স্থানীয় আদালতে নারোদা গ্রাম হত্যাকাণ্ডে জাল হলফনামা পেশ করে আদালতকে বিভ্রান্ত করার অভিযোগ আনেন। সেই পরিপ্রেক্ষিতেই গত ৩ ডিসেম্বর তিস্তার বিরুদ্ধে ভারতীয় অপরাধ দণ্ডবিধির একাধিক ধারায় মামলা করার আদেশ দেয় আদালত।

নরেন্দ্র মোদী

তিস্তা শিতলাবাদ

আদালতের এই রায়ের ঠিক একদিন আগে অর্থাৎ ২ ডিসেম্বর দেশের সর্বোচ্চ আদালতের কাছে ভৎর্সিত হয়েছিলেন তিস্তা। গুজরাট দাঙ্গায় সরকারী তরফে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সংশ্লিষ্ট ফোরামের দারস্থ হওয়ায় তিস্তাকে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করেছিল সুপ্রিম কোর্ট। আদালত তখনই মনে করেছিল, ভারতের সম্মানহানি করার জন্যই ইচ্ছাকৃতভাবে তিস্তা দেশের আইন-কানুন ও সংবিধানকে অগ্রাহ্য (পড়ুন অসম্মান) করে একে আন্তর্জাতিক রূপ দেবার চেষ্টা করছেন। তবে তিস্তার একদা ঘনিষ্ঠ সহযোগী রইস খান আদালতকে বিভ্রান্ত করার যাবতীয় অভিযোগ এখন তিস্তার ঘাড়ে চাপাতে চাইলেও, আগে রইসও যে তিস্তার কুকর্মের ভাগীদার ছিল একথা স্পষ্টভাবেই বলেছে কোর্ট। বিশেষ করে মামলার অন্যতম প্রত্যক্ষদর্শী নানুমিয়া মালিককে জাল হলফনামা পেশ করতে রইস বাধ্য করেছিলেন বলে আদালতে জানিয়েছে।

ইতিপূর্বে সুপ্রিম কোর্ট নিযুক্ত বিশেষ তদন্তকারী দলকে তদন্তের প্রয়োজনে যাবতীয় সাহায্য করেছেন মোদী। এমনকী নিজে ঘন্টার পর ঘন্টা অসীম ধৈর্য নিয়ে সব কাজ ফেলে বসে থেকে সিট-এর তদন্তকারী দলকে সহায়তা করেছেন মোদী। কিন্তু সবমিলিয়ে দেশবিরোধী সেকুলারপন্থী ও তাদের দোসর সংবাদমাধ্যম এনিয়ে নানা অপপ্রচার ও বিভ্রান্তিমূলক প্রচার চালিয়ে বিশ্ববাসীর সামনে ভারতবর্ষকে অপমানিত করার যাবতীয় পরিকল্পনা ছকে রেখেছিল; যে সেকুলারপন্থীদের সর্বাগ্রে ছিলেন তিস্তা শীতলাবাদেরা। কিন্তু দেশের সর্বোচ্চ আদালত ও অন্যান্য আদালত আরও একবার প্রমাণ করলো বিচারের বাণীর নীরবে নিভৃতে কাঁদার দিন এখনও আসেনি।

কি বলবেন বুদ্ধিজীবীরা ?

গুপ্তপুরুষ।। গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ক্লিন চিট দিয়েছে স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম (এস আই টি) বা বিশেষ তদন্তকারী দল। গোধরা পরবর্তী গুজরাতের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জন্য তিনি দায়ী নন তা সুপ্রিম কোর্টের কাছে জমা দেওয়া স্ট্যাটাস রিপোর্টে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে এস আই টি। এই রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে দাঙ্গার সঙ্গে নরেন্দ্র মোদীর যোগাযোগের কোনও প্রমাণ নেই। দুঃখের কথা এতকাল কোনওরকম বিচার বুদ্ধি যুক্তির বাইরে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গের সংবাদমাধ্যম

(এরপর ৪ পাতায়)

পরলোকে কালিদাস বসু

নিজস্ব প্রতিনিধি।। কালিদাস বসু আর নেই। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রাক্তন পূর্বক্ষেত্র সঙ্ঘচালক তথা অখিল ভারতীয় কার্যকরী মণ্ডলের সদস্য এবং স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের অন্যতম প্রবীণ ট্রাস্টী কালিদাস বসু গত ১১ ডিসেম্বর সকালে কলকাতা হাইকোর্ট সংলগ্ন নিজের চেম্বারে অকস্মাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোক গমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বৎসর। তিনি এক পুত্র, পুত্রবধূ ও নাতনী এবং আত্মীয়-স্বজনসহ বহু গুণমুগ্ধ মানুষকে রেখে গেছেন। সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারকে সান্ত্বনা জানিয়েছেন।

সঙ্ঘ পরিবারে তিনি কালিদা নামেই সুপরিচিত ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে বাংলায় সঙ্ঘের কাজের একটা যুগের অবসান হলো বলা যেতে পারে। বাংলায় সঙ্ঘের কাজ যাঁদের হাত ধরে শুরু হয়েছিল তিনি তাঁদের একজন। সেই ১৯৩৯ থেকে ২০১০— সত্তর বছরেরও বেশী সময় ধরে তিনি নিরলসভাবে সঙ্ঘ সাধনায় ব্রতী ছিলেন এবং একজন কর্মবীরের মতোই রামকৃষ্ণলোকে চলে গেলেন।

বাংলাদেশে ফরিদপুরে জন্মগ্রহণ করলেও শৈশবকাল থেকেই তাঁর জীবনের অনেকটাই কেটেছে উত্তর কলকাতায়। ১৯২৪ খৃস্টাব্দে বিজয়া দশমী তিথিতে তাঁর জন্ম। পিতা শরৎচন্দ্র বসু ও মা মনোরমা বসু। ক্যালকাটা অ্যাকাডেমি থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে তিনি ম্যাট্রিক পাশ করেন। পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এল এল বি এবং এম এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। প্রথম জীবনে কিছুদিন অধ্যাপনা করলেও ওকালতিকেই তিনি জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করেন এবং কলকাতা হাইকোর্ট ও সুপ্রীম কোর্টের একজন লব্ধ প্রতিষ্ঠিত ব্যবহারজীবী হিসাবে পরিচিত হন। তাঁর মৃত্যুতে কলকাতা হাইকোর্ট একদিন (১৩.১২.১০) কর্মবিরতি পালন করে।

১৯৩৯— কালিদা তখন নবম শ্রেণীর ছাত্র, সেসময় এক সহপাঠীর কাছে শুনলেন, মানিকতলা এলাকায় একজন মারাঠি যুবক ছেলেদের লাঠিখেলা শেখান এবং ইংরাজীতে কথা বলেন। সহপাঠীর সঙ্গে তিনি সেই লাঠিখেলার শিক্ষক যিনি ইংরাজীতে কথা বলেন তাঁকে দেখতে এসেছিলেন। লাঠিখেলার শিক্ষকের নাম বালাসাহেব দেওরস যিনি পরবর্তীকালে সঙ্ঘের তৃতীয় সরসঙ্ঘচালক হয়েছিলেন। বালাসাহেব শাখায় আসতে বললে কালিদা পরীক্ষার পর আসবেন বলে জানালেন। তখন বালাসাহেব তাঁকে বলেছিলেন— 'Do come'। বালাসাহেবের এই কথাটি কালিদার মনে গেঁথে গিয়েছিল। পরীক্ষার পর তিনি সেই যে শাখায় বা সঙ্ঘের কাজে অংশগ্রহণ করলেন আমৃত্যু তা বজায় ছিল। ১৯৪০ সালে বাংলার কয়েকজন স্বয়ংসেবকের সঙ্গে নাগপুরে সঙ্ঘশিক্ষা বর্গে (ও টি সি) যোগ দিতে যান। সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ হেডগেওয়ার-এর পথনির্দেশ লাভ করেন।

(এরপর ৪ পাতায়)

কলকাতায় মুসলিম মহিলাদের সমাবেশ

তালাকের বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কার

নিজস্ব প্রতিনিধি।। গত ৯ ডিসেম্বর পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে আসা দুই হাজারেরও বেশি তালাক প্রাপ্তা অথবা স্বামী কর্তৃক বিতাড়িতা মহিলা কলকাতায় কলেজ স্কোয়ারে এসে এক জনসভায় সমবেত হন ও পরে শোভাযাত্রা সহকারে মেয়ো রোডে গান্ধী-মূর্তির পাদদেশে এসে এক সভার মাধ্যমে তাদের জীবনের দুর্বিষহ কাহিনী তুলে ধরেন। প্রসঙ্গত, ওই দিনটি ছিল বিশ শতকের মুসলিম নারী শিক্ষার পুরোধা রোকেয়া শাখাওয়াত হোসেনের জন্মদিন। কলেজ স্কোয়ারের সভা আরম্ভ হয় ঠিক সকাল ১০ টায় রোকেয়ার প্রতিকৃতিতে মাল্যদানের মধ্যে দিয়ে। এই সভায় বক্তব্য রাখেন রোকেয়া নারী উন্নয়ন সমিতির কর্ণধার অধ্যাপিকা খাদিজা বানু, চন্দ্রাবী দালাল, শাশ্বতী ঘোষ, মানবাধিকার কর্মী রবীন্দ্রনাথ দত্ত এবং আরও অনেকে। সভায় উপস্থিত ছিলেন ধর্মমুক্ত মানবতাবাদী মঞ্চের নেতা ও সম্পাদক গিয়াসুদ্দিন এবং ডাঃ মজফ্ফর হোসেন। এই সভায় আটি-দশজন তালাকপ্রাপ্তা এবং স্বামী কর্তৃক বিতাড়িতা মহিলা তাদের দুর্বিষহ জীবনের কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন। জনৈকা মহিলা বলেন, তাদের বিবাহিতা ৯ জন বোনের মধ্যে তিনজন তালাকপ্রাপ্তা হয়ে এখন তাদের সন্তান-সন্ততিসহ বাপ ভাই-এর গলগ্রহ। খাদিজা বানু বলেন, সমীক্ষা করে দেখা গেছে প্রত্যেক গ্রামে ১০ থেকে ১৫ জন তালাক প্রাপ্তা এবং স্বামী কর্তৃক বিতাড়িতা মহিলা রয়েছেন। সব হিসাব করলে সবচেয়ে বেশি মুসলিম অধ্যুষিত জেলায় (৭০ শতাংশ) প্রায় তিন থেকে সাড়ে তিন লাখ মহিলা তালাকের শিকার হয়ে দিনাতিপাত করছে। অভাবের তাড়নায় বহু মহিলা ভিনরাজ্যে পাচার হয়ে যাচ্ছে। আজ পর্যন্ত এদের কাছে কোনও সরকারি সাহায্য যায়নি। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে খাদিজা বানু বলেন, এই কাজের জন্য তারা মৌলবাদী মুসলিম, মৌলভী, মওলানাদের থেকে প্রচণ্ড বাধা প্রাপ্ত হচ্ছেন। বক্তব্য রাখতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ দত্ত বলেন,

কলকাতায় তালাকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মিছিল।

(এরপর ৪ পাতায়)

বিদেশে সবচেয়ে বেশি রোজগেরে ভারতীয়রাই

নিজস্ব প্রতিনিধি।। 'পরবাসে কে রবে হায়'— গোছের আফসোস করার দিন বোধহয় এবার শেষ হতে চলেছে। সম্প্রতি বিশ্বব্যাঙ্ক 'মাইগ্রেশন অ্যান্ড রেমিট্যান্সেস ফ্যাক্টবুক ২০১১' শীর্ষক যে প্রতিবেদনটি প্রকাশ করেছে তাতে উল্লেখ করা হয়েছে ভারত-ই বিশ্বের পয়লা নম্বর স্থান অধিকার করেছে বিদেশ থেকে অর্থ প্রেরণ (রেমিট্যান্সেস) করার নিরীখে। অর্থাৎ প্রবাসে ভারতীয়রা যে পরিমাণ অর্থ উপার্জন করে, তার উদ্বৃত্ত অংশটুকু এদেশে পাঠান তার নিরীখে ভারতবর্ষ-ই এখন বিশ্বের এক নম্বর গ্রহীতা। গত বছর এই সামগ্রিক অর্থের পরিমাণ ছিল ৪৯.৬ বিলিয়ন ডলার, এবছর তা বেড়ে হয়েছে ৫৫ বিলিয়ন ডলার। অবশ্য অর্থ-প্রেরণের নিরীখে ভারত এক নম্বর স্থান অধিকার করলেও অর্থ-প্রেরকের সংখ্যার খাতিরে ভারতকে টপকে এক নম্বর স্থানটা দখল করে নিয়েছে মেক্সিকো। অর্থাৎ প্রবাসে যত সংখ্যক কর্মরত ভারতীয় দেশে অর্থ প্রেরণ করছেন, তার তুলনায় বেশি সংখ্যক মেক্সিকান মেক্সিকোয় টাকাকড়ি পাঠাচ্ছেন। বিশ্বব্যাঙ্কের সেই রিপোর্টটি বলছে, ২০১০-এ ১১.৯ মিলিয়ন মেক্সিকান প্রবাসী তাদের দেশে টাকাকড়ি পাঠিয়েছে। আর এই বছরেই ১১.৪ মিলিয়ন ভারতীয় এদেশে অর্থ পাঠিয়েছে। বলাই বাহুল্য, এই প্রবাসীদের কর্মস্থলের নিরীখে এক নম্বর স্থানটি আমেরিকার দখলে।

মজার ব্যাপার হলো, যে ১১.৪ মিলিয়ন প্রবাসী ভারতীয়-র কথা উল্লিখিত হলো, তাদের মধ্যে যদি ৫.৪ মিলিয়ন মানুষ এদেশে প্রত্যাবর্তন করেন তবে অভিবাসী (বসবাসের জন্য বিদেশে আগমনকারী) আকর্ষণকারী হিসেবে ভারত দখল করবে বিশ্বের দশ নম্বর স্থান ও এই ব্যাপারে এশিয়ায় মিলবে শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা। বিশ্বব্যাঙ্কের রিপোর্টটিতে বলা হয়েছে ভারত ও চীনে এই মুহূর্তে যে পরিমাণ প্রেরিত অর্থ আসে বিদেশ থেকে তার সামগ্রিক পরিমাণ সারা বিশ্বের হিসেবে প্রায় এক-চতুর্থাংশ। এবছরে বিশ্বের বিভিন্ন দেশগুলিতে বাইরে থেকে আসা অর্থের পরিমাণ মোট ৪৪০ বিলিয়ন ডলার। অন্যদিকে স্রেফ ভারত আর চীনে তাদের বিদেশ থেকে আসা অর্থের পরিমাণ যথাক্রমে ৫৫ বিলিয়ন ডলার ও ৫১ বিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ ভারত ও চীনের বিদেশ থেকে আসা সামগ্রিক অর্থের পরিমাণ ১০৫ বিলিয়ান ডলার। এই যে প্রবাস থেকে আগত অর্থ-প্রবাহের তথ্য দেওয়া হলো তাতে বিশ্বব্যাঙ্কের প্রতিবেদনে উল্লিখিত হয়েছে— উক্ত আয়ের দেশগুলোতে এরকম অর্থের পরিমাণ সব মিলিয়ে মাত্র ১০৭ বিলিয়ন ডলার।

অর্থনীতিবিদগণ মনে করছেন এতে আশ্চর্য হওয়ার কোনও কারণ নেই যে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বিদেশ থেকে আসা অর্থের পরিমাণ সবচাইতে বেশি, প্রায় ৩২৫ কোটি টাকা যা গত বছরের থেকে ৬ শতাংশ বেশি। তবে এর পাশে সামগ্রিক ভাবে এই তথ্যটিও উল্লেখযোগ্য যে মধ্য আয়ের দেশগুলো যেমন ভারত, চীন, রাশিয়া, মেক্সিকো, পাকিস্তান, ইজিপ্ট, তুরস্ক— এদের গত বছরের থেকে এবছরে বাইরে থেকে আগত অর্থের পরিমাণ ৩০১ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছে গিয়েছে। অন্যদিকে নিম্ন আয়ের দেশসমূহ যেমন বাংলাদেশ, তাজিকিস্তান, নেপাল, উগান্ডা, কম্বোডিয়ার মতো দেশগুলিতে বিদেশ থেকে প্রেরিত অর্থের পরিমাণ মাত্র ২৪ বিলিয়ন ডলার। যার মধ্যে শুধু বাংলাদেশেই আসে বার্ষিক ১১ বিলিয়ন ডলার অর্থ।

প্রবাসী প্রেরিত অর্থ-সমৃদ্ধ দেশ (২০১০)		
ভারত	৫৫	বিলিয়ন ডলার
চীন	৫১	বিলিয়ন ডলার
মেক্সিকো	২২.৬	বিলিয়ন ডলার
ফিলিপাইনস	২১.৩	বিলিয়ন ডলার
ফ্রান্স	১৫.৯	বিলিয়ন ডলার
জার্মানী	১১.৬	বিলিয়ন ডলার
বাংলাদেশ	১১.১	বিলিয়ন ডলার
বেলজিয়াম	১০.৪	বিলিয়ন ডলার
স্পেন	১০.২	বিলিয়ন ডলার
নাইজেরিয়া	১০	বিলিয়ন ডলার
কোন দেশে কত প্রবাসী (২০১০)		
মেক্সিকো	১১.৯	মিলিয়ন
ভারত	১১.৪	মিলিয়ন
রাশিয়া	১১.১	মিলিয়ন
চীন	৮.৩	মিলিয়ন
ইউক্রেন	৬.৬	মিলিয়ন
বাংলাদেশ	৫.৪	মিলিয়ন
পাকিস্তান	৪.৭	মিলিয়ন
ইংল্যান্ড	৪.৭	মিলিয়ন
ফিলিপিন্স	৪.৩	মিলিয়ন
তুরস্ক	৪.৩	মিলিয়ন

তথ্যসূত্র : মাইগ্রেশন অ্যান্ড রেমিট্যান্সেস ফ্যাক্টবুক ২০১১, বিশ্ব ব্যাঙ্ক।

এই সময়

নাব্যতা

নাব্যতা নিয়ে এমনিতেই সঙ্কটে থাকা কলকাতা বন্দরের সমস্যা আরও বাড়ল। সমস্যাটির সূত্রপাত গত ২৩ নভেম্বর। ওইদিন একটি মালবাহী জাহাজ 'টাইগার স্প্রিং'-এর সঙ্গে 'এম ভি গ্রীনভ্যালি'র মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে মালবাহী জাহাজটি ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। গত ৬ ডিসেম্বর মধ্যরাত নাগাদ কলকাতা বন্দরের খুব কাছেই জাহাজটি ডুবে যেতে থাকে। এর ফলে সব চ্যানেল-ই আটকে যায়। ইতিপূর্বে ওইদিন সকালে হুগলি চ্যানেলে পণ্যবাহী জাহাজটি ২০০ মিটার ডোবে। জাহাজের পণ্যগুলিও ডুবতে শুরু করে। ফলে চ্যানেলটির নাব্যতা তখন-ই বেশ কমে যায়। এর পরবর্তী পর্যায়ে কলকাতা বন্দরের খুব কাছে জাহাজটির ডুবে যাওয়া নিশ্চিতভাবেই বন্দরের নাব্যতাকে আরও সঙ্কটজনক করে তুলবে।

নগদ অর্থ

কেন্দ্রীয় সরকারের অদূরদর্শিতায় দেশের সরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে যে নগদ অর্থ (কাঁচা টাকা)-র অভাব (কৃত্রিম?) সৃষ্টি হয়েছে তা বেশ বোঝা গেল স্টেট ব্যাঙ্কের সাম্প্রতিকতম সিদ্ধান্তে। স্টেট ব্যাঙ্ক অব্ ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে গত ৬ ডিসেম্বর জানানো হয় যে ৭ ডিসেম্বর থেকে 'ফিক্সড ডিপোজিট'-এর ক্ষেত্রে সুদের হার বাড়ানো হচ্ছে। যেমন যাঁরা ৪৬-৯০ দিনের জন্য টাকা ফিক্সড ডিপোজিট করবেন তাদের সুদের হার ১৫০ বেসিস পয়েন্ট (প্রতি শতাংশের পয়েন্ট ১০০ বেসিস পয়েন্টের সমান) থেকে বাড়িয়ে ৫.৫০ শতাংশ করা হয়েছে। আর যাঁরা ৮ থেকে ১০ বছরের জন্য টাকা ব্যাঙ্কে স্থায়ীভাবে জমা রাখবেন তারা সবচেয়ে লাভবান হবেন। তাদের ক্ষেত্রে ভারতীয় স্টেটব্যাঙ্ক ৮.৭৫ শতাংশ হারে সুদ দেবে।

বোধোদয়

পাকিস্তানের রাজনৈতিক ও সামরিক দশার চেয়েও হতশ্রী যে সেখানকার ক্রিকেটীয় পরিস্থিতি তা এতদিনে বোধগম্য হয়েছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিলের। বেটিং দুর্নীতিকাণ্ডে একের পর এক পাক ক্রিকেটারের নাম জড়িয়ে যাওয়ায় কোনও পাকিস্তানী ক্রিকেটারকেই সদ্য-আসন্ন আই পি এল ৪-এর নিলামে না ডাকার জন্য ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডকে পরামর্শ দিল আই সি সি। ইতিপূর্বে আই পি এল-৩-এর সময়েই অভিযোগ উঠেছিল যে কাশ্মীরসহ বিভিন্ন ব্যাপারে ভারত-বিরোধী ষড়যন্ত্র ও নাশকতামূলক কাজের ব্যাপারে জড়িত যে পাকিস্তান, ভারতীয় ফ্র্যাঞ্চাইজীগুলির সেই পাকিস্তানী ক্রিকেটারদেরই খেলানোর যৌক্তিকতা কোথায়? তখন ক্রিকেট আর রাজনীতিকে গুলিয়ে না ফেলার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার বিস্তর আবেদন-নিবেদন করেছিল। ভিন্ন প্রেক্ষিতে হলেও আই সি সি-র পরামর্শ যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শরদ পাওয়ার পরিচালিত বি সি সি আই তথা কেন্দ্র সরকারকে বিপাকে ফেলবে তা বলাই বাহুল্য। তবে নিন্দুকেরা বলছেন, সেই বিপদ 'কূটনৈতিক' নয়, 'সংখ্যালঘু ভোট-ব্যাঙ্ক' জনিত!

কূটনীতির গতিপ্রকৃতি

পদার্থবিদ্যার স্টাইলে ভারতকে 'ধ্রুবক' (কনস্ট্যান্ট) হিসেবে ধরে বিশ্ব-বাজারে কূটনৈতিক গতি-প্রকৃতি মাপছেন বিশেষজ্ঞরা। আর এভাবেই তাঁরা সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে বর্তমানে আমেরিকার সঙ্গে ইউরোপীয় ইউনিয়নের একটা ঠান্ডা লড়াই চলছে। কূটনীতিজ্ঞদের এহেন সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর কারণ ফরাসী দেশের প্রেসিডেন্ট নিকোলাস সারকোজী সাম্প্রতিক সস্ত্রীক ভারত সফরে কুড়ি বিলিয়ন ডলারের চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছেন। এই অর্থের পরিমাণ নভেম্বরের শেষে ওবামার সফরে ভারত-মার্কিন পারস্পরিক চুক্তিকৃত অর্থের পরিমাণের প্রায় দ্বিগুণ। আরও মজার ব্যাপার, ভারত-ফ্রান্স চুক্তি হয়েছে মূলতঃ দু'দেশের নিউক্লিয়ার শক্তি ও জ্বালানী শক্তির মতো বিষয়ে। এর স্পর্শকাতরতা স্পর্শ করছে খোদ মার্কিন প্রেসিডেন্টকেও। তবে কূটনীতিকদের আমেরিকার সঙ্গে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সংঘাতের ধারণা দৃঢ় হয়েছে ৪৬ সদস্য বিশিষ্ট ও বিশ্বের দেশগুলির কাছে আভিজাত্য সম্পন্ন গোষ্ঠী (এলিট গ্রুপ) নিউক্লিয়াস সাপ্লায়ার্স গ্রুপ (এন এস জি)-এ ভারতকে পুরোপুরি সদস্য করে নিতে প্রকাশ্য সমর্থন দানের কথা ইউরোপীয় দেশ জার্মানী ঘোষণা করে দেওয়ায়।

সেনসেক্স পতন

টেলিকম দুর্নীতিসহ একাধিক আর্থিক কেলেঙ্কারী ঢাকতে কেন্দ্র মরিয়া প্রয়াস চালালেও শাক দিয়ে যে বেশিদিন মাছ ঢাকা যাবে না তা বুঝিয়ে দিল ৯ ডিসেম্বরের শেয়ার মার্কেট। এক ধাক্কায় ৪৫৪ পয়েন্টের পতন ঘটিয়ে ১৯,২৪২.৩৬ পয়েন্টে শেষ হয় দিনের শেষের শেয়ার সূচক। বোম্বে স্টক মার্কেটের পাশাপাশি ভারতীয় শেয়ার সূচক নিফটিরও পতন হয় ১৩৭.২০ পয়েন্ট। অথচ বিশ্ববাজারে ওইদিন শেয়ার-বাজারের অবস্থা যথেষ্ট ভাল ছিল। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, শুধু আর্থিক কেলেঙ্কারী-ই নয়, সাম্প্রতিক অস্বাভাবিক দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি (কংগ্রেস জড়িত একাধিক আর্থিক দুর্নীতি, সংবাদমাধ্যমে যে খবরকে যথেষ্ট ব্যাকফুটে ঠেলে রেখেছে)-ও এই শেয়ার সূচক পতনের জন্য দায়ী।

বইমেলা তুমি কার?

কল্লোলিনী কলকাতার অন্যতম গর্ব বইমেলা কাদের? আমাদের না ওদের? জিজ্ঞাসা করতেই পারেন পুস্তকপ্রেমী শহরবাসী। বুকসেলার্স গিল্ড সদ্য-আসন্ন কলকাতা বইমেলা-তে খোদ মহানাগরিককেই আমন্ত্রণ জানাতেই ভুলে গেছে। কাদের অঙ্গুলি হেলনে? অন্যদিকে মহানাগরিক শোভন চট্টোপাধ্যায় স্পষ্টই বলেছেন, বইমেলা বলে পাবলিশার্স ও বুকসেলার্স গিল্ড-কে আলাদা করে সুবিধা দেবার প্রশ্নই আসে না। এই শুনে জনৈক ব্যক্তির প্রশ্ন— বই নিয়েও আমরা-ওরা? নিন্দুকের উত্তর— হবে না! বইয়ের আসল কারবারী (আসল কারবারী প্রকাশক নয়, বুদ্ধিজীবীরাই। কারণ বুদ্ধির ওপর ভরসা রেখে জীবিকা নির্বাহ করতে গেলে বইয়ের দরকার তাদেরই সবচেয়ে বেশি)-রা আছে যে! তবে একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় এবার 'আমাদের' বইমেলা। সামনের বারটা কি হবে জানা নেই! যদিও 'ওদের' হবার সম্ভাবনাটাই ৯৯.৯৯ শতাংশ বেশি!

গহনা যদি গড়াতে চান যে
কোনও স্বর্ণকারকে
স্থপার
ক্যাটলগ দেখাতে বলুন
সুরেন্দ্র চন্দ্র বসাক এণ্ড সন্স
১৫-ডি, গরাণহাটা স্ট্রীট, কলি -৬

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী
নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।
শান্তিনিকেতন, বোলপুর
ফোন - (০৩৪৬৩) ৫৬২২২

HB ®
INDIA'S NO. 1 IN
ISI MARKED
HEAVY PIPE FITTINGS
AN ISO 9002 CERTIFIED CO.
Authorised Distributor
NATIONAL PIPE &
SANITARY STORES
54, N. S. Road
Kolkata-700001
Ph : 2210-5831/5833
15, College Street, Kol-12
Ph : 2241 7149 / 8174
Sister Concern
Partha Sarathi
Ceramics
4, College Street,
Kolkata-700012
Ph: 2241 6413 / 5986
Fax : 033-22256803
e-mail : npss@vsnl.net
website :
www.nationalpipes.com

সানরাইজ
শাহী
গরম মশলা

সানরাইজ
মশলা
রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়
STRATEGY 22033

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

বামপন্থী বিভেদ পন্থা

সংসদের ইতিহাসে কোনও অধিবেশনের একটি দিনও বিরোধী পক্ষের সকল সদস্যরা সামবেতভাবে অংশগ্রহণ করেন নাই এমন উদাহরণ বোধ হয় নাই। এবারের শীতকালীন অধিবেশন চলাকালীন ঠিক এমনটিই হইয়াছে। টেলিকম মন্ত্রী, মন্ত্রক ও মন্ত্রকের আমলাবাহিনীর দুর্নীতি কম্পট্রোলার এ্যান্ড অডিটর জেনারেল (ক্যাগ) ফাঁস করিবার পর দীর্ঘদিন সততার আলখাল্লার আড়ালে থাকা আমাদের প্রধানমন্ত্রী সেই রিপোর্ট চাপিয়া রাখিয়াছিলেন। স্বনামখ্যাত রাজনীতিবিদ সুব্রমানিয়াম স্বামী যদি আদালতের দ্বারস্থ না হইতেন, তাহা হইলে হয়তো ভারতবর্ষের মানুষ সততার তথাকথিত প্রতিমূর্তি মনমোহন সিংহের নেতৃত্বাধীন ইউ পি এ সরকারের আরেকটি ভয়াবহ দুর্নীতির খবর জানিতেই পারিতেন না।

উচ্চ আদালতের মতে এই দুর্নীতি ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক ভয়াবহ কলঙ্কের চিহ্ন স্বরূপ। এই দুর্নীতি লইয়া প্রথম দিকে প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকারও আদালত তীব্র সমালোচনা করিয়াছে। তাহারই পরিণাম স্বরূপ অনিচ্ছুক টেলিকম মন্ত্রী ডি. রাজাকে পদত্যাগও করিতে হইয়াছে। টেলিকম মন্ত্রকের তৎকালীন সচিব টি. জে. টমাসও এই এক লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার কোটি টাকার টু. জি. স্পেকট্রাম কন্ট্রোল দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার হইল এই স্পেকট্রাম কেলেঙ্কারী বা দুর্নীতির সহিত সরাসরি যুক্ত একজন ব্যক্তিকে সনিয়া কংগ্রেস সেন্ট্রাল ভিজিল্যান্স কমিশনের (সি ভি সি) সর্বোচ্চ পদ কমিশনার হিসেবে নিযুক্ত করিলেন। এইরকম দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তি শাসক দলের নেতানেত্রী বা মন্ত্রীদের দুর্নীতির প্রতি 'ভিজিল্যান্স' করিবেন অর্থাৎ সজাগ দৃষ্টি রাখিবেন— ইহা কী সম্ভব?

এইরকম সকল দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রধানত বিজেপি নেতৃত্বাধীন এন. ডি. এ জোট সংসদে সোচ্চার হইয়াছে। তাহাদের দাবী যৌথ সংসদীয় কমিটি (জে পি সি) গঠন করিয়া অবিলম্বে টেলিকম দুর্নীতির তদন্ত শুরু করিতে হইবে। কংগ্রেসী প্রধানমন্ত্রী যেমন শুরু হইতেই এই দুর্নীতি চাপা দেওয়ার জন্য বেশী তৎপর ছিলেন, সনিয়ার অঙ্গুলি হেলনে যৌথ সংসদীয় কমিটি (জে পি সি) গঠনেও ঠিক তেমনি আচরণ করিয়া চলিয়াছেন। তাঁহার এই একগুঁয়েমির কারণ বুঝিতে বেশী জ্ঞানের প্রয়োজন নাই। কখনও তিনি বলিতেছেন পি এ সি অর্থাৎ পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি থাকিতে আবার জে পি সি কী প্রয়োজন! কিন্তু তিনি বলিতেছেন না যে জে পি সি'-র বদলে পি এ সি-এরই বা কী প্রয়োজন? উভয়ের পার্থক্য কী কিছু নাই? নিশ্চয়ই আছে—তাহা না হইলে পূর্ণ অধিবেশন কাল ধরিয়া এই একগুঁয়েমিরই বা কী প্রয়োজন ছিল? সনিয়া নামক এক বিদেশিনীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস দলের এ হেন জাতীয় স্বার্থবিরোধী কাজ জনগণের চোখে কংগ্রেসের কী ইমেজ গড়িয়া উঠিবে তাহা জনগণই জানেন!

কংগ্রেস ও ইউ পি এ সরকার পি এ সি-র যুক্তি ছাড়িয়া এখন আবার বিজেপি শাসিত কর্ণাটক সরকারের দুর্নীতির উল্লেখ করিয়া বিজেপি-র জে পি সি-র দাবী নস্যাৎ করিতে উদ্যত হইয়াছে। বিজেপি-র নামে দুর্নীতির উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অভিযোগ আনিয়া নিজেদের আড়াল করিতে উদ্যত হইয়াছে। যেন বিজেপি দুর্নীতি করিলে কংগ্রেসেরও দুর্নীতি করিবার অধিকার জন্মায়। সনিয়ার নির্দেশ বিজেপি এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বিরুদ্ধে নানান আক্রমণ ইদানিং শুরু হইয়াছে। সি বি আই, সি ভি সি, ক্যাগ, সি. ই ডি এবং নানান ধরনের সরকারী দপ্তর এখন কংগ্রেস দলের এক একটি বিভাগে পরিণত হইয়াছে। সনিয়ার এই নির্দেশেই সম্প্রতি বলির পাঁঠা হইয়াছে দিগ্বিজয় সিং। হেমন্ত কারকারের মৃত্যুর জন্য হিন্দুত্ববাদী সংগঠনকে জড়িত করিবার বিরুদ্ধে স্বয়ং কারকারের স্ত্রীই বিরোধিতা করিয়াছেন। যাহা হউক, সনিয়ার এই কংগ্রেস অনেক প্রতিহিংসাপরায়ণ। সুতরাং সাধু সাবধান।

কিন্তু চিন্তার বিষয় হইল বামপন্থীগণ। এই প্রজাতিটি আরও ভয়াবহ, কংগ্রেস-বিরোধিতার পালে হাওয়া লাগিতেই তাহারা সেই হাওয়ায় গা ভাসাইয়া দিয়াছে। আন্দোলনের ডাক দিয়া আন্দোলন ভাঙ্গিতে তাহারা ওস্তাদ। এক্ষেত্রে তাহারও জে পি সি-র দাবিতে নামিয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু কাহার বিরুদ্ধে এই আন্দোলন? সনিয়ার সুরে সুর মিলাইয়া তাহারাও বলিতেছে বিজেপি-র নাকি কংগ্রেসের দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন করিবার কোনও নৈতিক অধিকার নাই। এই হইল বামপন্থী বিভেদপন্থা। ইহা নিঃসন্দেহে সনিয়া কংগ্রেসকেই সাহায্য করিবে না কি? বলিতে দ্বিধা নাই বামপন্থীরাও দুর্নীতির পঙ্কে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। পশ্চিমবঙ্গের মানুষমাত্রই জানেন এই বামপন্থী সরকার কতটা দুর্নীতিগ্রস্থ। দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলনে বামপন্থী বিভেদ পন্থারও দৃঢ়তার সহিত মোকাবিলা করিতে হইবে।

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

ভারত মা কি বিলীন হয়ে যাবেন? সবার সেই প্রাচীন জননী, যার স্বরূপই হচ্ছে মহৎ, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ভাবাপন্ন। এই সেই দেশ যেখানে মুনি ঋষিরা ভ্রমণ করেছেন, যে দেশে আজও মনুষ্যরূপী ভগবান বাস করেন, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নেন। সেই প্রাচীন ঋষিদের জ্ঞানের আলো নিয়ে হে আমার ভাই, তোমায় আমি অনুসরণ করবো এই বিশ্বের নগর-গ্রামে, সমতল-অরণ্যে, এই বিশাল বিশ্বে—যদি তুমি আমায় দেখাতে পার এই দেশের মতো মানুষ অন্য কোথায় আছে?

—স্বামী বিবেকানন্দ

সমাজের স্বার্থে সরব মুসলিম মহিলারাও
আশু প্রয়োজন অভিন্ন দেওয়ানী বিধি

তারক সাহা

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ বা ভারতীয় জনতা পার্টি নয়, এবার অভিন্ন দেওয়ানী বিধির সপক্ষে সরব হয়েছেন মুসলীম মহিলা সংগঠনও। সারাদেশে সংবিধানের বিধি লাগু হবার পর থেকেই এ নিয়ে সরব ছিল রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ, তৎকালীন জনসঙ্ঘ এবং অধুনা বিজেপি। কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলির কাছ থেকে এ নিয়ে অনেক গঞ্জনা সহ্য করতে হয়েছে ওই সংগঠনগুলিকে।

দেশে সংবিধান চালু হবার ষাট বছর বাদে এবারে সরব হয়েছেন মুসলীম

মহিলারা। শরিয়ত বিধির তিন তালাকে পুরুষদের একচ্ছত্র আধিপত্য অনুসারে বিবাহ বিচ্ছেদ এবং তৎপরবর্তী নারীদের দুর্দশা নিয়ে এবারে রাস্তায় নেমে প্রতিবাদে গর্জে উঠেছে 'বেঙ্গল, ফোরাম ফর মুসলিম উইমেনস রাইট অ্যান্ড এমপাওয়ারমেন্ট' নামক মহিলা সংগঠনটি।

১৯৫০ সালে দেশে যখন সংবিধানের বিধি প্রবর্তন হলো তখন এর প্রণেতারা কতগুলি বিষয় সংবিধানের মৌলিক অধিকারের মধ্যে না এনে সেগুলি 'রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণের নির্দেশিকা' বা ডাইরেক্টিভ প্রিন্সিপ্যাল অফ্ স্টেট পলিসি-তে অন্তর্ভুক্ত করলেন। এর মধ্যে এলো 'অভিন্ন দেওয়ানী বিধি', দেশের শিশুদের অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তনের মতো বিধিগুলি। পরবর্তীকালে ১৯৫৬ সালে নেহরু সরকার হিন্দুসমাজে বহুবিবাহ রদে হিন্দুবিবাহ আইন (১৯৫৬) চালু করল। বিবাহ বিচ্ছেদে নারী-পুরুষ দুজনেরই সম্মতিকে স্বীকৃতি দেওয়া হলো। কতগুলি শর্ত চাপানো হলো বিবাহ-বিচ্ছেদকে বৈধতা দিতে। পরবর্তীকালে সংবিধানের চতুর্থ অংশে যেখানে 'ডাইরেক্টিভ প্রিন্সিপ্যালস অফ্ স্টেট পলিসি'-তে বর্ণিত অন্যান্য অনুচ্ছেদগুলি, যেমন নাগরিকদের জন্য পুষ্টিকর আহারের ব্যবস্থা ও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নকরণ (অনুচ্ছেদ ৪৭), শিশুদের জন্য বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রণয়ন (অনুচ্ছেদ ৪৫) ইত্যাদি অনুচ্ছেদগুলি সরকার দেশব্যাপী চালু করলেও 'অভিন্ন দেওয়ানী বিধি' চালু করার নির্দেশ (অনুচ্ছেদ ৪৪)-কে কার্যকর করা নিয়ে নেহেরু সরকার থেকে শুরু করে ইউ পি এ-২ সরকার চুপচাপ। নেহেরু সরকার 'হিন্দু বিবাহ আইন' প্রণয়ন করলেও মুসলমানদের ব্যক্তিগত আইন স্পর্শ করতে সাহস পেল না নাকি রাজনৈতিক তোষণের কারণে বিষয়টা এড়িয়ে গেলেন— সেই প্রশ্নটা থেকেই গেছে।

বিষয়টা নিয়ে বিতর্কের সূত্রপাত সেই থেকে। মুশকিল হলো সংবিধানের তৃতীয় অংশ যেখানে মৌলিক অধিকার ও মৌলিক কর্তব্য বর্ণিত আছে, সেখানে কোনও ধারা লঙ্ঘিত হলে আদালত তাতে হস্তক্ষেপ করবে এবং নাগরিকদের অধিকার যাতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয় তার ব্যবস্থা করবে আদালত। কিন্তু 'রাষ্ট্রের নীতি নির্দ্ধারণের নির্দেশিকা'য় বর্ণিত অনুচ্ছেদগুলিতে বর্ণিত অধিকার সম্পর্কে কোনও ব্যবস্থা নিতে আদালত অক্ষম। অর্থাৎ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৬ থেকে ৫১ পর্যন্ত বিষয়গুলির ওপর আদালতের কোনও এক্তিয়ার নেই। বিষয়গুলি পুরোপুরি সরকারের এক্তিয়ারভুক্ত। সুতরাং চার দশকের বেশি হলেও শিশুদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক লাগু করল সরকার। সেরকম অভিন্ন দেওয়ানী বিধিও লাগু করার ব্যবপারে আদালত কোনও ব্যবস্থা নিতে পারবে না। তবে বিভিন্ন সময়ে দেশের উচ্চতম আদালত সুপারিশ ও টিপ্পনি কেটেছে এই বিষয়ে। কিন্তু সরকার এ ব্যাপারে একেবারেই চুপ।

গত ৯ ডিসেম্বর সংস্কারপন্থী মুসলীম লেখিকা রোকেয়া শাখায়াত হোসেনের জন্মদিন উপলক্ষে রাজ্যের তালাকপ্রাপ্ত মহিলারা তাদের দুর্দশার কথা শোনাবার জন্য এক সম্মেলনের আয়োজনের কথা ঘোষণা করেছিল (বিবরণ-প্রথম পৃষ্ঠার সংবাদে)। তারা তাদের ৫ দফা দাবীসনদ পেশ করেছে মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্যপালকে।

মুসলীম সমাজে বৈষম্যের শিকার হয় একেবারে নিচুতলার মহিলারা। গরীব মহিলারা তাদের স্বামী দ্বারা তালাকপ্রাপ্ত হলে সামাজিক পুনর্বাসন খুব মুশকিল। পুরুষরা শরিয়তি আইন অনুসারে বহুবিবাহ করতে পারলেও মহিলারা তা পারে না। ফলে পরবর্তীকালে তালাকপ্রাপ্তারা দেহব্যবসার মতো পেশায় চলে যায়। ফোরামের বক্তব্য হলো— কোরান-হাদিশের মুসলীম বিবাহ ও জীবনযাপনের যে ব্যাখ্যা তা যুগোপযোগী পরিমার্জন করেছে বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়ার মতো বহু মুসলীমরাষ্ট্র। ব্যতিক্রম কেবল ভারত। এইসব দেশগুলিতে শরিয়তি বিধানগুলি সংস্কার করেই দেশের আইন তৈরি হয়েছে। এমনকী পড়শি বাংলাদেশেও তালাক সংক্রান্ত আইন পাল্টে বলা হয়েছে স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার পরে যত শীঘ্র সম্ভব ইউনিয়ন পরিষদ বা পুরসভার চেয়ারম্যানকে নোটিশ দিতে হবে। ইচ্ছা প্রকাশের ৯০ দিনের মধ্যে নোটিশ না দিলে তালাক বাতিল হয়ে যাবে। নোটিশ পাওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে উভয়পক্ষের মধ্যে বোঝাপড়ার জন্য চেয়ারম্যান এক সালিশি কাউন্সিল গড়বেন। তালাক দেওয়ার সময়ে স্ত্রী গর্ভাবস্থায় থাকলে গর্ভাবস্থা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তা কার্যকর করা যাবে না।

কিছুটা হলেও আইনি আচ্ছাদন বাংলাদেশে পায় সেদেশের নারীরা। কিন্তু এদেশে মহিলারা একেবারে বে-আব্রু। এদেশে তালাকপ্রাপ্ত নারীরা শ্বশুরদ্বারা নির্যাতিত হবার ঘটনা ঘটলেও সমাজ শ্বশুরকে শাস্তি না দিয়ে নির্যাতিতা মহিলা শাস্তি পেয়েছে এমন ঘটনা বিরল নয়। অতীতে শাহবানু-র মামলায় সুপ্রীম কোর্ট খোরপোষের বিধান দিলেও ভোটের রাজনীতির জন্যই রাজীব সরকার সংসদে আইন পেশ করে তা নাকচ করে দেয়।

অর্থাৎ এদেশে মুসলীম নারীরা যা চাইছে তা অভিন্ন দেওয়ানী বিধি চালু করারই নামান্তর। হিন্দুদের মতো তারাও চায় তালাকপ্রাপ্তরা শ্বশুরবাড়ীর সম্পত্তির ভাগীদার হতে। তারাও চায় তালাকের ক্ষেত্রে তাদের মতামতকেও স্বীকৃতি দেওয়া হোক। এমনই সব বৈপ্লবিক কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে 'বেঙ্গল ফোরাম ফর মুসলিম উইমেনস রাইট অ্যান্ড এমপাওয়ারমেন্ট'-এর কণ্ঠে। বাংলায় প্রতিবাদী কণ্ঠ শোনা গেলেও সারাদেশে এর প্রভাব কতটা পড়বে তা অবশ্য সময়ই বলবে, তবে মুসলিম মহিলা সমাজে এমন একটা চেতনার জাগরণ এসেছে— এটা ভাল খবর। প্রশ্ন হলো, কিন্তু এর প্রভাব কতটা পড়বে এরাজ্যে? নির্বাচন সামনে, এরাজ্যের দাদা-দিদি দুই যুযুধান রাজনৈতিক কোষ্ঠীর এ নিয়ে ভাবনা চিন্তার সময় কোথায়? তাছাড়া মুসলীম রাজনীতি নিয়ন্ত্রিত হয় স্থানীয় মসজিদগুলির মোল্লা-মৌলবীর দ্বারা আর সেখানে পুরুষদের আওয়াজই উচ্চকিত। কাজেই বেফাঁস কোনও সিদ্ধান্ত নিয়ে সংগঠিত এই ভোট ব্যাঙ্ককে হারাতে রাজী নয় এরাজ্যের কোনও রাজনৈতিক দলই। বরং ফোরামের স্মারকলিপি দুই রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের কোনও একটি দল ক্ষমতায় এলে তা ঠাণ্ডা ঘরে ফেলে রাখার সম্ভাবনা নিশ্চিত জেনেও এটা সুখকর যে বিলম্বিত হলেও মুসলীম মহিলারা নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্য ভাবনা চিন্তা শুরু করেছে। মুসলীম মহিলাদের এই দাবী দেশে অভিন্ন দেওয়ানী বিধির প্রবর্তনেরই নামান্তর। আরেকবার মুসলীম মহিলারা নিজেদের

পরলোকে কালিদাস বসু

(১ পাতার পর)

১৯৪২ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানী বোমা পড়ার পর ভয়ে বহু মানুষ কলকাতা ছেড়ে চলে যান। ওই সময় তিনি বিদ্যার্থী বিস্তারক হিসেবে নবদ্বীপে যান এবং সেখানে সঙ্ঘের কাজ শুরু করেন। পরে ১৯৪৯ থেকে ১৯৫২ পর্যন্ত প্রচারক হিসাবে কলকাতায় সঙ্ঘের কাজ দেখাশোনা করেন। ক্রমে তিনি সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ কার্যবাহ, প্রান্ত কার্যবাহ, প্রান্ত সঙ্ঘচালক, পূর্বক্ষেত্র সঙ্ঘচালকের দায়িত্ব পালন করেন। অসংখ্য স্বয়ংসেবক তাঁর সান্নিধ্যে এসে প্রেরণা লাভ করেছে। স্বয়ংসেবকদের ব্যক্তিগত সুবিধা-অসুবিধা শুধু নয়, তাদের পরিবারের সঙ্গেও তাঁর আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। শুধু নিজে নন, তাঁর সহধর্মিণী প্রয়াত প্রতিমা বসুকেও তিনি রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির কাজে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। কালিদার বাড়ী ছিল স্বয়ংসেবকদের কাছে অবারিত দ্বার।

পশ্চিমবঙ্গে ন্যাশনাল ল ইয়ার্স ফোরামের তিনি প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। সল্ট লেক বা লবণহ্রদের তিনি প্রথম দিককার (১৯৭০) বাসিন্দা এবং লবণহ্রদ নাগরিক সমিতির প্রথম প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী ভূতেশানন্দ ছিলেন তাঁর আধ্যাত্মিক গুরু। মঠ ও মিশনের বিভিন্ন কেন্দ্রে তাঁর নিয়মিত যাতায়াত ছিল। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ চর্চা ছিল তাঁর-জীবনচর্যার অঙ্গ। বিশ্বজয়ী বিবেকানন্দ সহ তিনি বেশ কয়েকটি গ্রন্থের প্রণেতা। কালিদা নিয়মিত রোজনামচা বা ডাইরি লিখতেন। জীবনের শেষ দিনটিতেই তিনি তা লিখেছেন।

তাঁর মরদেহ বাড়ী থেকে সল্ট লেকে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রম হয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে নিয়ে আসা হয়। সেখানে স্বস্তিকার সম্পাদক, প্রকাশকসহ অন্যান্যরা তাঁর মরদেহে মাল্যার্পণ করে শ্রদ্ধা জানান। এরপর কেশবভবনে নিয়ে আসা হয়। সেখানে গীতাপাঠ, সংক্ষিপ্ত স্মৃতিচারণ এবং অন্তিম প্রণাম জানানো হয়। সঙেঘর বরিষ্ঠ অধিকারীরা এবং স্বয়ংসেবকরা তাঁর মরদেহে মাল্যার্পণ করেন। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, ন্যাশানাল ল' ইয়ার্স ফোরাম, বিদ্যার্থী পরিষদ, ভারতীয় জনতা পার্টি, পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রম, বিবেকানন্দ বিদ্যাবিকাশ পরিষদ, ভারতীয় মজদুর সঙঘ, সংস্কার ভারতী, সংস্কৃত ভারতী, সেবা ভারতী, বাস্তুহারা সহায়তা সমিতি, বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙঘ, ভারতীয় কিষাণ সঙঘ, বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সঙঘ, ইতিহাস সংকলন সমিতি, রাষ্ট্র সেবিকা সমিতি, সক্ষম, বিজ্ঞান ভারতী প্রভৃতি সংগঠনের পক্ষ থেকে তাঁর মরদেহে মাল্যার্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। এরপর নিমতলা শ্মশানঘাটে তাঁর অন্তিম সংস্কার সম্পন্ন হয়।

কি বলবেন বুদ্ধিজীবীরা ?

(১ পাতার পর)

একতরফাভাবে নরেন্দ্র মোদীকে গুজরাতের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জন্য অভিযুক্ত করে ফাঁসি দিতে চেয়েছিল। রাজ্যের ছোট বড় ডান বাম সব সংবাদপত্রই একযোগে প্রচার চালিয়েছিল নরেন্দ্র মোদীই দাঙ্গার খলনায়ক। কলকাতার যে সব বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা সদাই মঞ্চ আলো করে দাঙ্গার নানা নেপথ্য কাহিনী শুনিয়ে আসর জমান তাঁরা এখন কোথায়? কোন ইঁদুরের গর্তে লুকিয়েছেন? এইতো সেদিন বিহারের নির্বাচনে নীতিশ কুমার নরেন্দ্র মোদীকে ব্রাত্য করেছিলেন। তখন কলকাতার বুদ্ধিজীবী তথা গোটা বাঙালি সাংবাদিককুল আনন্দে হাততালি দিয়েছিল। এরা সকলেই একযোগে দাবি করেছিল নীতিশ কুমারের জনতা দল ইউনাইটেড ভাল ফল করলেও বিজেপি বিহারে মুসলিম জনরোষে উড়ে যাবে। নির্বাচনী ফলাফল ঘোষিত হওয়ার পর দেখা যায় বিহারে সেরা জয় হয়েছে বিজেপিরই। দ্বিতীয় স্থানে আছে জনতা দল ইউনাইটেড। আর জনরোষে উড়ে গেছে কংগ্রেস। পাটনায় প্রদেশ কংগ্রেসের অফিসে বাতি জ্বালাবার কর্মীটিও 'ভাগলবা'। দেশজুড়ে সীমাহীন আর্থিক দুর্নীতি এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যবস্তুর লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধির জন্য দায়ী কংগ্রেস নেতৃত্ব এখন ভারতের সবচেয়ে ঘৃণ্য দল। তামিলনাড়ু, কেরল, উত্তরপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ ইত্যাদি রাজ্যে আসন্ন বিধানসভার নির্বাচনে কংগ্রেসের যে নিশ্চিত ভরাডুবি হতে চলেছে তা চোখ বন্ধ করে বলে দেওয়া যায়।

কংগ্রেস দেশজুড়ে জনসমর্থন হারিয়েছে। এই অতি তিক্ত সত্যটি দিল্লিতে দলের নেতৃত্বেরও অজানা নেই। ডুবন্ত মানুষ যেভাবে খড়কুটো ধরে বাঁচতে চায় সেভাবেই মরিয়া কংগ্রেস নেতৃত্ব মুসলিম তাস খেলছে। দেশের সংবাদমাধ্যম বোঝাতে চাইছে মুম্বাইতে ২৬/১১ পাক- সন্ত্রাসবাদীদের হামলায় নিহত পুলিশ অফিসার হেমন্ত কারকারের মৃত্যু বিতর্কে জড়িত এ আই সি সি-র সাধারণ সম্পাদক দিগ্বিজয় সিংহ যে 'হিন্দু সন্ত্রাসবাদ' প্রসঙ্গটি টেনেছেন তা তাঁর নিজস্ব মত। ভেবেচিন্তে মন্তব্যটি করেননি। কথাটা মিথ্যা। দিগ্বিজয় যে কথা বলেছেন তা কংগ্রেস দলেরই বক্তব্য। কারণ 'গেরুয়া সন্ত্রাসবাদ' 'হিন্দু মৌলবাদী সন্ত্রাস' ইত্যাদি কংগ্রেস নেতৃত্ব দীর্ঘদিন ধরেই বলছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি. চিদাম্বরম এর আগে 'গেরুয়া সন্ত্রাসবাদ' কথাটা বলে যথেষ্ট শোরগোল তুলেছিলেন। সুতরাং দিগ্বিজয় তাঁর ব্যক্তিগত মত প্রকাশ করেছেন বলে বিষয়টিকে সংবাদমাধ্যম যে লঘু করে দেখাতে চাইছে তা ঠিক নয়। আসলে কংগ্রেস মুসলিম ভোট ব্যাঙ্ক আঁকড়ে ধরে কেরল, উত্তরপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গে বাঁচতে চাইছে। কিন্তু এভাবে যে দলকে বাঁচানো যায় না তা হাড়ে হাড়ে বুঝেছেন বিহারের নির্বাচনে লালুপ্রসাদ—রামবিলাসরা। জাতপাতের রাজনীতি করতে গিয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁদেরও ভরাডুবি হয়েছে। নির্বাচনের ঘন্টা বাজলেই মুসলিম সমাজের উন্নয়নের জন্য মায়াকান্নায় 'সংখ্যালঘু ভোট' এখন আর পাওয়া যায় না। এই সত্যটি কংগ্রেস নেতৃত্বকে বোঝাবে কে?

পশ্চিমবঙ্গে ৩৫ বছর ধরে টানা ক্ষমতায় থাকা শাসকদল সি পি এম এবং প্রধান বিরোধী দল তৃণমূল কংগ্রেস এখন রীতিমত প্রতিযোগিতা করে মুসলিম তোষণ করছে। রাজ্যের সি পি এম মুখ্যমন্ত্রী মুসলিমদের সরকারি চাকরিতে সংরক্ষণ চালু করলে জবাবে তৃণমূল নেত্রী রেলের চাকরিতে মুসলিম প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দিচ্ছেন। সাম্প্রতিককালে রেলের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তিনি 'সালাম', 'আদাব', 'সুক্রিয়া' ইত্যাদি বাক্য ব্যবহারে নিজেকে মুসলিম সমাজের একজন বলে প্রমাণ করতে চাইছেন। এ' সবই মুসলিম ভোট পেতে ছলনা। ভোটের পর সব দরদ কর্পূরের মতো হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে। এই সহজ সরল সত্যটি রাজ্যের মুসলিম সমাজ যত তাড়াতাড়ি বিহারকে দেখে শেখেন ততই তাদের মঙ্গল।

তালাকের বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কার

(১ পাতার পর)

বেগম রোকেয়ার মৃত্যুর পর তাঁর দেহ কবরখানায় কবর দিতে দেননি। রোকেয়ার অপরাধ তিনি মুসলিম নারীদের শিক্ষার জন্য স্কুল খুলে ছিলেন, তার নামাজ-ই-জানাযায় এ. কে. এম ফজলুল হক (অবিভক্ত বাংলার প্রধান মন্ত্রী) এবং বহু গণ্যমান্য মুসলমান উপস্থিত ছিলেন। তাদের শত চেষ্টার ফলেও অপারগ হয়ে তার মৃতদেহ পাণিহাটীতে তার এক আত্মীয়ের বাড়ীতে কবর দেওয়া হয়।

মেয়ো রোডে গান্ধী মূর্তির পাদদেশে জনসভার সভাপতিত্ব করেন দুই হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি মলয় সেনগুপ্ত। বক্তব্য রাখেন, বেঙ্গল ফোরাম ফর মুসলিম উইমেনস রাইট অ্যান্ড এমপাওয়ারমেন্ট-এর কনভেনার ডঃ আফরোজা খাতুন, অধ্যাপক অমিতাভ চক্রবর্তী, অধ্যাপক আলাউদ্দিন মণ্ডল, স্বপন ঘোষাল প্রমুখ। বক্তারা প্রত্যেকেই অত্যন্ত ঝাঁঝালো ভাষায় তিন তালাকের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখেন এবং স্বাধীনতার ৬৩ বৎসর পরও একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে কিভাবে মুসলিম নারীরা তালাকের স্টিম রোলারের নিচে পিষ্ঠ হচ্ছেন তার জন্য সরকারের দিকে আঙ্গুল তোলেন, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের মতো একটা বাম শাসিত রাজ্যে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এসোসিয়েটেড প্রফেসার ডঃ মালেকা বেগম-এর বক্তব্য সকলের মন কাড়ে। তিনি বলেন, যেখানে বাংলাদেশের মতো একটি মুসলিম প্রধান দেশে মুখের কথায় তালাক দেওয়ার যুগের অবসান হয়েছে বহুদিন আগে, সেখানে ভারতের মতো একটি ধর্মনিরপেক্ষ দেশে এখনও কি করে এই অমানবিক প্রথা চলছে তা তিনি বুঝে উঠতে পারছেন না। তিনি মেয়েদেরকে সমস্ত বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে সাহসের সঙ্গে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। ফোরামের দাবিগুলি হলো—

(১) তালাক দেওয়ার সম-অধিকার (নারী ও পুরুষের) থাকবে এবং তালাক হবে আদালতের মাধ্যমে। (২) একাধিক স্ত্রী (বহুবিবাহ)-প্রথা নিষিদ্ধ করতে হবে। (৩) উত্তরাধিকার সম্পত্তির সমঅধিকার দিতে হবে। (৪) দত্তক আইন চালু করতে হবে। (৫) নির্যাতিতা, তালাকপ্রাপ্ত, স্বামী পরিত্যক্তা ও বিধবা মহিলাদের স্বনির্ভর করার করার প্রকল্প চালু করতে হবে।

শোক-সংবাদ

পরলোকে হরেকৃষ্ণ দাস

সমাজসেবী হরেকৃষ্ণ দাস গত ২ ডিসেম্বর পূর্ব মেদিনীপুর জেলার বামুনিয়া গ্রামে পরলোক গমন করেছেন। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙেঘর প্রবীণ প্রচারক অরবিন্দ দাস তাঁর দ্বিতীয় পুত্র। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। স্ত্রী, ছয় পুত্র, এক কন্যা, পুত্রবধূ ও নাতি-নাতিনী সহ বহু গুণমুগ্ধদের রেখে গেছেন। বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। বামুনিয়া গ্রামের শাখাটির তিনি ছিলেন অভিভাবক স্বরূপ। যেখান থেকে চারজন স্বয়ংসেবক প্রচারক হিসেবে স্বদেশ ও হিন্দুসমাজের সেবায় ব্রতী হয়েছেন।

* * *

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙেঘর মালদা জেলার প্রবীণ স্বয়ংসেবক তথা সমাজসেবী বদ্রীনারায়ণ দাস (৯০) গত ২৭ নভেম্বর পরলোক গমন করেছেন। তিনি মালদার মাধবনগর হাইস্কুলের জায়গাটি তার মাতৃদেবী বাদলমনির নামে দান করেন। তাছাড়া বর্তমানে সঙেঘর নিবাস ও সরস্বতী শিশু মন্দির তাঁর জায়গাতেই রয়েছে। স্বয়ংসেবকদের কাছে তিনি মামা হিসাবে পরিচিত। বদ্রীনারায়ণ দাসের ইচ্ছা অনুসারে তার শবদেহ সঙেঘর কার্যালয় হয়ে যায় এবং তাঁর মরদেহে পুষ্পার্ঘ্য দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয়।

* * *

মালদা জেলা বিজেপি সভাপতি শ্যামচাঁদ ঘোষের পিতা গোবিন্দ ঘোষ (৯১) গত ২৫ নভেম্বর পরলোক গমন করেছেন।

* * *

মালদা নেতাজী সুভাষ রোড সরস্বতী শিশু মন্দিরের আচার্য প্রেমচাঁদ নিয়োগী (৩৯) গত ২৩শে নভেম্বর এক আকস্মিক পথ দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছেন। নিজে মটরসাইকেল নিয়ে মঙ্গলবাড়ি ব্রিজ পার হওয়ার সময়ে ট্রাকের সঙ্গে ধাক্কা লাগলে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, একপুত্র ও এক কন্যাকে রেখে গেছেন। দীর্ঘ ১৩ বছর ধরে প্রেমচাঁদ শিশু মন্দিরের আচার্য ছিলেন। তার মৃত্যুতে সাহাপুরে শোকের ছায়া নেমে আসে।

* * *

সঙেঘর মালদা বিভাগ সম্পর্ক প্রমুখ নির্মল নাথের মাতৃদেবী চণ্ডীবালা নাথ (৯০) গত ২৩ নভেম্বর মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘি থানার খৈরাটী গ্রামে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তিনি সাত পুত্র, দুই কন্যা ও নাতি নাতনীদের রেখে গেছেন।

* * *

চলে গেলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙেঘর ব্যারাকপুর জেলার কামারহাটি নগর কার্যবাহ বিমল কর্মকারের পিতা অমূল্যচন্দ্র কর্মকার। গত ২৩ নভেম্বর তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯০ বছর। স্ত্রী সহ তাঁর তিন পুত্র, এক কন্যা ও নাতি-নাতনিরা বর্তমান।

রাজ্য রাজনীতি

সি পি এমের শুদ্ধিকরণ ফাটকাবাজি ছাড়া কিছু নয়

নিশাকর সোম

রাজ্য-রাজনীতিতে দুটি যুযুধান পক্ষের রাজনৈতিক এবং সাংগঠনিক তৎপরতা দেখা যাচ্ছে। এই দুটি পক্ষ হলো শাসক সিপিএম তথা বামফ্রন্ট এবং বিরোধী দল তৃণমূল।

নিমজ্জমান সিপিএম এখন খড়কুটো ধরে ভাসতে চাইছে। সিপিএমের বিগত কেন্দ্রীয় কমিটির সভা থেকে কার্যত পশ্চিমবঙ্গের নেতৃত্বকে দোষত্রুটি কাটিয়ে নির্বাচনী ফলাফলের সাফল্য দেখাবার কথাই বলা হয়েছে। এর কারণ এই কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় রাজ্য-সিপিএম-এর সম্পাদক বিমান বসু রাজ্যে তাদের অগ্রগতির কথা উল্লেখ করেন।

এ-রাজ্যের সিপিএমের নেতারা বর্তমানে বিভিন্ন ভাগে কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। প্রথমত এবং প্রধানত পার্টির মধ্যে নিষ্ক্রিয়তা কাটিয়ে নিচের তলার কর্মীদের উজ্জীবিত করে তোলা। তারই অঙ্গ হিসাবে গৌতমদেব এবং রেজ্জাক মোল্লা বহুদিন আগে থেকেই পার্টির দোষত্রুটির স্বীকারোক্তি দিয়েছিলেন। গৌতমবাবু ২৪ পরগণার পার্টি সদস্যদের সভায় বলেছিলেন— "পার্টিতে মাতববরি করবে —দুর্নীতিগ্রস্ত হবে, তাদের তাড়িয়ে দোব।"

গৌতমবাবু যখন একথা বলছেন সেসময়ই উত্তর ২৪ পরগণার তিন নেতার বিরুদ্ধে শাস্তি দেবার সিদ্ধান্ত জেলা-কমিটিতে আলোচনা করা হয়েছিল এবং তা রাজ্য-কমিটির অনুমোদনের জন্য অপেক্ষামান। এই তিনজন নেতা হলেন লক্ষ্মণ ভট্টাচার্য, রণজিৎ দাশ এবং কল্যাণ দাশ। গৌতমবাবু যতই গর্জন করুক, পার্টির রাজ্য নেতৃত্ব তা আমল দিলেন না। রাজ্য পার্টির সম্পাদক বিমান বসু ও মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য হস্তক্ষেপে কল্যাণ দাশ, রণজিৎ দাশ এবং লক্ষ্মণ ভট্টাচার্য-কে বহিষ্কার বা কোনও গুরুতর শাস্তি দেওয়া হলো না। লক্ষ্মণবাবুকে তো বুদ্ধদেববাবুরা 'গুডম্যান' এবং 'সুসংগঠক' হিসাবে গণ্য করেন। রণজিৎবাবুকে দলের নির্বাচিত সব পদ থেকে অপসারণের সিদ্ধান্ত হয়েছে, আর কল্যাণবাবুকে জেলা কমিটি থেকে অপসারণ করা হয়েছে। এর নাম ভোট বড় বালাই।

এরফলে এতোদিন 'স্বস্তিকা' পত্রিকায় যা লেখা হয়েছে, তা সত্য-এ পরিণত হলো। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে শুদ্ধিকরণের জন্য কোনও পার্টিসদস্যকে (যাঁরা নেতৃত্বের ন্যাওটা) বহিষ্কার করা হবে না। ব্যাপারটা হলো এইরকম— পূজার পাঁঠাবলি বন্ধ করে কুমড়ো লাউ আখ-এর বলি দেওয়ার ব্যবস্থা। এর ফলে সমগ্র পার্টির মধ্যে নেতাদের ছত্রছায়াতে দুর্নীতির আখড়া বসবে। নেতারা জানেন, কাঁচের ঘরে বসে ঢিল না-ছোড়াই বাস্তব। আরও জানেন, কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে কেউটে বেরোবে না তো। তাই নম নম শাস্তি— এটাই কমিউনিস্ট পার্টি।

এঁদের বিরুদ্ধে নাকি অভিযোগ— তাঁদের আয়ের সঙ্গে সম্পত্তির সাযুজ্য খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। লক্ষ্মণ ভট্টাচার্য জ্যোতি বসুর প্রিয়পাত্র এবং কাশীপুর-বরানগরে-কংগ্রেস-নেতা নির্মল চ্যাটার্জি হত্যার বদলাতে যে গণহত্যা হয়েছিল, তাতে নাকি তাঁর সাহায্য ছিল? এই সত্যটা কবে গৌতমবাবুরা জানলেন। নাকি জেনেই কিছু করার 'সাহস' পূর্বে দেখাতে পারেনি। শোনা যায়, বহিষ্কৃত রণজিৎ দাশ নাকি ৩৪ সি ও ৩৪বি রুটের একাধিক বাসের মালিক। এঘটনা তো দীর্ঘ কয়েক বছর আগেই ঘটেছিল। বরানগর পার্টির সম্মেলনে পার্টিসভ্যরা লক্ষ্মণ ভট্টাচার্য প্রমুখের বিরুদ্ধে কথা তোলেন। সেখানে সম্মেলনে উত্তেজিত হয়ে জনৈক প্রবীণ পার্টিসদস্য অজ্ঞান হয়ে যান। এমন কথাও ওঠে— লক্ষ্মণবাবুকে নাকি বরানগর জুট মিলের মালিক সারদা ভ্রাতৃদ্বয় একটি গাড়ি ব্যবহার করতে দিয়েছিলেন। উল্লেখ্য করা প্রয়োজন, সারদাদের বরানগর জুট মিলে পার্টির একটি রাজ্য-সম্মেলন করা হয়েছিল এবং জুটমিলের মধ্যে প্রতিনিধিদের থাকবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এ-সবই রাজ্য-নেতৃত্ব মেনে নিয়েছিলেন। লক্ষ্মণ ভট্টাচার্যকে প্রয়াত পরিবহণ মন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী আর টি এ-এর গুরুত্বপূর্ণপদে নিয়োগ করেছিলেন। সুভাষ চক্রবর্তী এমনই শক্তিশালী ছিলেন যে 'একদা বহিষ্কৃত' প্রাক্তন রাজ্য-সভার সদস্য নেপালদেব ভট্টাচার্যকে জেলা কমিটিতে পুনরায় 'নির্বাচিত' করিয়ে ছেড়েছিলেন। পার্টির সাধারণ সম্পাদক কি বলেন? নেপালদেব বহিষ্কৃত হয়ে নেতৃত্বের পদে ফিরে আসতে পারলেন— সে তুলনায় কি প্রাক্তন লোকসভার সদস্য সৈফুদ্দিন চৌধুরী 'অপরাধ' কি বেশি ছিল? লেকটাউন-এ সুভাষবাবুর ঘনিষ্ঠরা হোমরাচোমরা হয়ে উঠেছিলেন, তাঁর কথায় প্যাথোলজিক্যাল সেন্টার, চোখের চিকিৎসাগার চলে। তিনি প্রবীণ প্রাক্তন সদস্যদের সঙ্গে রুঢ় ব্যবহার করতেন আর বলতেন, "কবে ঘি খেয়েছেন তাঁর গন্ধ ছড়াবেন না।" সুভাষ-ভক্ত এই নেতাকে এবার আর জোনাল কমিটিতে নির্বাচিত হতে দেয়নি অমিতাভ গোষ্ঠী। এই নেতার আয় এবং সম্পত্তির সম্পর্কে জেলা নেতারা কি সন্তুষ্ট? শোনা যায় এর-ই পুত্রের বিবাহে লক্ষাধিক টাকা খরচ হয়েছিল। সংবাদে প্রকাশিত হয়েছিল, জাল কিটের ব্যাপারেও নাকি বরানগর জুটের মালিকগণ জড়িত ছিলেন? অতি আশ্চর্যের ব্যাপার হলো এ-ব্যাপারে তৃণমূলসহ কোনও বাম-বিরোধী দল কোনও তদন্তের দাবি করেননি। কেন?

পার্টির অভ্যন্তরীণ দুর্নীতির বিরুদ্ধে গৌতমদেব-দের পদক্ষেপ একেবারেই উদ্দেশ্যমূলক। কমিউনিস্ট পার্টির প্রথা হলো— পার্টির মধ্যে গোষ্ঠীবাজিতে হেরে গেলে পরাজিত গোষ্ঠীর কাউকে তাড়াবার জন্য মহিলা, আর্থিক এবং পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগকারী বলে বহিষ্কার করা হয়।

চটকলের কথা যখন উঠছে-তখন বলতে হয়, বেঙ্গল চটকল মজদুর ইউনিয়নে রাজ্য-নেতৃত্বের মধ্যে কি এমন নেতা বিরল যে যিনি বিত্তবান হয়েছেন, চারচাকার গাড়ি চড়ে চটকল মজুরদের আন্দোলন পরিচালনা করেন? এটা ঠিক চটকলে অন্য দলের যাঁরা সংগঠন করেন তারাও ধোয়া তুলসী পাতা নয়। চটকলের মালিকদের 'আর্থিক সঙ্কট' কাটানোর জন্য মাঝেমধ্যেই প্রায়ই ক্লোজার ঘোষিত হয়। লোকে বলে নেতাদের সঙ্গে কথা বলে এই কাজ করে থাকেন মালিকরা।

গৌতমবাবু বলছেন, 'আয়নায় মুখ দেখুন। নেতার ছাতার তলায় আশ্রয় নেয় প্রমোটাররা। এই প্রমোটাররাই পার্টির একাংশকে পরিচালিত করছে।' এখানে একটা কথা উল্লেখ করা যায়। তা' হলো প্রয়াত কমিউনিস্ট নেতা তথা ভূমিরাজস্ব মন্ত্রী বিনয় চৌধুরী বলেছিলেন— "গভর্মেন্ট বাই দি প্রমোটার ফর দি প্রমোটার অ্যান্ড অফ দি প্রমোটার।" এই কথার উত্তরে তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু বলেছিলেন — "বিনয়বাবু তা'হলে মন্ত্রিত্ব ছাড়ছেন না কেন?" গৌতমবাবু আপনি কি বড়সড় আবাসন-এর নির্মাণ-এ প্রমোটারদের সাহায্য নেননি?

রেজ্জাক মোল্লা বলেছেন, "পার্টির লোকেদের তেল হয়েছে। ৩৫ বছরে কি করেছেন? যা করেছেন তাই ফেরত আসছে।"

এখন আবার সিপিএম নেতারা ক্ষমতায় ফেরবার এবং বিরোধীদের হুমকি দিয়ে জয়ের ফানুস ওড়াচ্ছেন। এর ফলে নিচের তলার কর্মীদের ঔদ্ধত্য বাড়াতে সাহায্য করছেন।

বামফ্রন্টের অন্য শরিকদলগুলি দ্বিমুখী নীতি নিয়েছেন। সিপিআই-এর শ্রমিক সংগঠন বলেছে— "বামফ্রন্ট সরকার শ্রমিক-বিরোধী নীতি নিয়েছেন।" আর এস পি দলের পক্ষ থেকে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম প্রভৃতি সবকটি ইস্যুতেই সিপিএম-এর তীব্র সমালোচনা করেছেন।

আর এস পি-এর শ্রমিক সংগঠনের একনেতা তো একটি নবপ্রসূত সংবাদপত্রে নিয়মিতভাবে সিপিএম-এর নিন্দা করে চলেছেন। এই দলের কৃষক সংগঠনের প্রতিবেদনে কৃষক-হত্যাকারী বলে সমালোচনা করা হয়েছে সিপিএম-এর নীতির।

ফরওয়ার্ডব্লক দল তো মমতাকে নিয়েই সভা করেছিল। এখন তাদের কৃষক-যুব সংগঠনের রিপোর্ট-এ বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে গণ-বিরোধী বলে তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে। কোচবিহারে গুলি চালানার বিরুদ্ধে ফরওয়ার্ড ব্লক-এর সমালোচনা ছিল তীব্র।

এই সমস্ত দলের নিচের তলার সভ্য-অনুগামীরা কি সিপিএম-কে "কাট টু সাইজ" করবেন না? অবশ্য এইসব দলের নেতারাও মনেপ্রাণে চান সিপিএম-এর বিধায়ক সংখ্যা হ্রাস হয়ে যাক। এই অবস্থায় বামফ্রন্টের সরকারে ফেরা দূর অস্ত।

পার্টির অভ্যন্তরীণ দুর্নীতির বিরুদ্ধে গৌতমদেব-দের পদক্ষেপ একেবারেই উদ্দেশ্যমূলক। কমিউনিস্ট পার্টির প্রথা হলো— পার্টির মধ্যে গোষ্ঠীবাজিতে হেরে গেলে পরাজিত গোষ্ঠীর কাউকে তাড়াবার জন্য মহিলা, আর্থিক এবং পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগকারী বলে বহিষ্কার করা হয়।

অ রকম

প্রতিবাদী সিদ্ধান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ 'টেকনোলজি'র মাহাত্ম্যে ঘাটতি পড়েছে, এহেন বদযুক্তি অন্তত এই কলিযুগে দেওয়া সম্ভব নয়। একটা সময় ছিল যখন ম্যাষ্টর-রা (দ্রষ্টব্য-শরৎচন্দ্রের 'বিন্দুর ছেলে', এলাকেশীর মন্তব্য) ঘুষ-টুস ইত্যাদি না পেলে ছাত্রকে ফেল-টেল করিয়ে দিতে পারতেন বিলক্ষণ। এলোকেশীর মন্তব্য যে আগাগোড়াই মিথ্যে, একথা শরৎচন্দ্র অনুরাগী পাঠকমাত্রেরই জানা রয়েছে। তবে কালের খাতিরে ভিন্ন প্রেক্ষিতে একথাও সত্যি যে 'ম্যাষ্টর'কূলের উদ্ভব একটা সময়ে ভারতভূমিতে হয়েছিলই। তবে এরপাশে এ কথাও হাজারবার সত্যি যে সত্যিকারের মাষ্টারমশাইয়েরাও তখন ছাত্রসমাজের যথেষ্ট শ্রদ্ধার পাত্রই ছিলেন। কালক্রমে 'শিক্ষা' (এডুকেশন) পরিণত হলো ব্যবসায়। মাষ্টারমশাইয়েরা হারিয়ে গেলেন। জাঁকিয়ে বসলো ম্যাষ্টররা।

মনোবিদরা অনেকেই বলেছিলেন বর্তমান 'টেকনোলজি এরা'য় (যুগ) শিক্ষকদের হাতে ছাত্রদের 'মার' খাওয়াটাই ভবিতব্য। কারণ প্রতিযোগিতা যেভাবে দিনের পর দিন বাড়ছে, তাতে করে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ও তাদের অভিভাবকদের উপরও চাপ বাড়ছে। আর শিক্ষকদের 'ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি' এই ব্যবসায়িক সুযোগটাই নিচ্ছে। তবে এই 'টেকনোলজি এরা'য় টেকনোলজি-রই চরমতম ব্যবহার করে শিক্ষকের অত্যাচারের প্রতিবাদ করল ১২ বছরের হায়দরাবাদ নিবাসী একটি ছেলে। নাম সিদ্ধান্ত টোটলা।

গত ৯ নভেম্বর সোস্যাল নেটওয়ার্কিং সাইট 'ফেসবুক'-এ সেন্ট পলস্ হাইস্কুলের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র সিদ্ধান্তের 'পেজ'-এ লেখা হয়েছিল—'আই অ্যাম ম্যাড' (আমি পাগল)। বন্ধুরা এটা নিয়ে বেশ ঠাট্টার সুরেই তার প্রত্যুত্তর দিয়েছিল। ব্যাপারটা যে অত সোজা নয় তা বোঝা গেল তার পরদিনই। সেদিন অর্থাৎ ১০ নভেম্বর শিক্ষকের অত্যাচারের যাবতীয় চিহ্নস্বরূপ নিজের পৃষ্ঠদেশ ও মুখের ছবি প্রকাশ করে দেয় সিদ্ধান্ত। তার হালৎ এরকম করে দেওয়ার জন্য বার্তায় জর্জ স্যারকেই দায়ী করে সে। লেখে— জর্জ স্যার, একজন শিক্ষক বা দানব। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, জর্জ স্যারটি হলেন বায়োলজির জনৈক শিক্ষক। পড়া সঠিকভাবে না পারার অজুহাতেই সম্ভবত তিনি সিদ্ধান্তকে চপেটাঘাত করেন। সিদ্ধান্তও বুঝে যায় স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল সুধাকর রেড্ডি নিশ্চিতভাবেই বাঁচাতে চাইবেন সহকর্মী জর্জকে। তাই তার ওপর অত্যাচারের বর্ণনা বিশ্ববাসীকে জানাতে ফেসবুক ব্যবহার করার অভিনব 'সিদ্ধান্ত' নেয় সিদ্ধান্ত।

সিদ্ধান্তের এই কৌশলে বেজায় চাপে পড়ে গিয়েছেন হায়দরাবাদের সেন্ট পলস হাইস্কুলের অধ্যক্ষ সুধাংশুবাবু। আমতা আমতা করে বলার চেষ্টা করেছিলেন 'নিজের ওপর অত্যাচারটা ঠিক কি ধরনের হয়েছে তা বলতে পারেনি সিদ্ধান্ত।' যদিও সিদ্ধান্তের বাবা রাজেন্দ্রনাথ টোটলার বক্তব্য— "জর্জকে যখন এ নিয়ে জিজ্ঞাসা করা হয় তখন তিনি সোজাসুজি কোনও কথা না বলে বাঁকা-টেরা একটা উত্তর দেন। এমনকী, সিদ্ধান্তের মাথা গুলিয়ে দেবারও চেষ্টা করছিলেন তিনি।"

হাজার হোক, সিদ্ধান্তের পিঠের দাগগুলো তো মিথ্যে হবার নয়। তাই জর্জ মাস্টারকে আপাতত সাসপেন্ডই করেছে স্কুল-কর্তৃপক্ষ। সিদ্ধান্তের বাবা-মা চেষ্টা চালাচ্ছে, ঘটনার স্মৃতি মুছে দিয়ে তাকে সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে। আমাদেরও তাই প্রার্থনা। তবে ঘটনার স্মৃতি মুছে যাক। কিন্তু বেঁচে থাকুক প্রতিবাদটুকু।

গত ১০ নভেম্বর জর্জ স্যারকৃত যাবতীয় অত্যাচারের চিহ্নস্বরূপ ফেসবুকে উদয় সিদ্ধান্ত টোটলার।

বাংলাদেশী বহিষ্কার নিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্যকে ভর্ৎসনা হাইকোর্টের

গুয়াহাটি থেকে বাসুদেব পাল।। গুয়াহাটি হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি বি কে শর্মার নেতৃত্বাধীন ডিভিশন বেঞ্চ গত ২৬ নভেম্বর অসমে স্থায়ী হয়ে যাওয়া বাংলাদেশী নাগরিকদের চিহ্নিতকরণ ও বাংলাদেশে ফেরৎ পাঠানোর ব্যাপারে অসম রাজ্য সরকার, কেন্দ্র সরকার এবং বি এস এফ এর গয়ংগচ্ছ মনোভাবের জন্য তীব্র ভর্ৎসনা করেছে।

সম্প্রতি ট্রাইব্যুনালে বাংলাদেশী নাগরিক বলে চিহ্নিত ১৩ জন ভারত সরকারকে পক্ষ নির্দিষ্ট করে পিটিশন করে। গুয়াহাটি হাইকোর্টে এই মামলা— 'আতাউর রহমান ভার্সেস ভারত সরকার এবং অন্যান্যরা' বলে চিহ্নিত। এই মামলায় বিচারপতি শর্মার মন্তব্য— 'অসমে বাংলাদেশী নাগরিকদের ব্যাপকহারে উপস্থিতি এক বাস্তব ঘটনা। কিন্তু কেন্দ্র সরকার, রাজ্য সরকার এবং বি এস এফ বিষয়টাকে গুরুত্ব দিয়ে দেখেন না। চিহ্নিত বাংলাদেশীদের বাংলাদেশে ফেরৎ পাঠানোর জন্য কোনও কার্যকর ব্যবস্থা এখনও অবধি গৃহীত হয়নি। সাধারণভাবে আদালতের অভিজ্ঞতা হলো, বাংলাদেশী পুশব্যাকের পর বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ তাদেরকে পাল্টা পুশব্যাক করে ভারতে ঢুকিয়ে দেয়। আর তারা (বাংলাদেশী নাগরিকরা) বেপাত্তা হয়ে যায়। সাম্প্রতিক মামলার ওই তেরোজন বাংলাদেশী হলো— অ্যাজপা খাতুন, গোপাল চন্দ্র দাস, পারুল দাস, আতাউর রহমান, ওজিদুর রহমান, বাহারা খাতুন, অলেকউদ্দিন, আনোয়ারা খাতুন, রামাল বিশ্বাস, সালেমা বিবি, আমিনা খাতুন, হামিদা খাতুন এবং আয়েষা বিবি। বিচারপতি শর্মা এধরনের ঘটনাকে বাস্তবিক দুর্ভাগ্যজনক বলে আখ্যা দিয়েছেন। এই তেরোজন ছাড়াও অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রেই একইরকম নীতি নেওয়া হয় বলে শ্রীশর্মা মন্তব্য করেছেন। তাঁর কথায় ট্রাইব্যুনালে বিদেশী চিহ্নিত হওয়ার পর ওই লোকেরা কোর্টে পিটিশন করে। সেই পিটিশন নাকচ হওয়ার পর আদালতের আদেশ পালিত হয় না। আর ওই চিহ্নিতরা জনারণ্যে হারিয়ে যায়। ২৬ তারিখের (নভেম্বর '১০) রায়ে বিচারপতি শর্মার নেতৃত্বাধীন ডিভিশন বেঞ্চ পাঁচদফা নির্দেশ দিয়েছেন—

(১) রাজ্য সরকারকে সম্পূর্ণ মনযোগ

দিয়ে পাসপোর্ট আইন-১৯২০ (ভারতে ঢোকার সময়)-র যাবতীয় নিয়মাবলী প্রয়োগ করতে হবে। ওই আইনের ৪নং ধারায় এক জন সন্দিগ্ধ বিদেশী (বাংলাদেশী নাগরিক) কোনও বৈধ কাগজপত্র ছাড়া (যেমন, পাসপোর্ট) প্রবেশ করলে তা দণ্ডনীয় অপরাধ এবং সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্তৃপক্ষকে ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে আদালতে সোপর্দ করা উচিৎ। এবং পরবর্তী আইনী প্রক্রিয়া চালু করা উচিৎ।

(২) রাজ্য সরকারকেও পুরোপুরি কেন্দ্র সরকারের প্রদত্ত সার্কুলার-১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৯৭ এবং ৯ সেপ্টেম্বর ১৯৯৮, এছাড়া ২০০৯ সালের ২৩ নভেম্বর জারি করা সংশোধিত সার্কুলার লাভ করতে হবে। এসবই কেন্দ্র সরকার গত ২২ নভেম্বর ২০১০ এক হলফনামা পেশ করে সূচিত করেছে।

(৩) রাজ্য সরকারকে অবশ্যই অভিবাসন আইন-১৯৫০ (Expulsion from Assam) সম্পূর্ণ কার্যকর করতে হবে। সর্বানন্দ সোনায়াল-১ মামলায় সুপ্রীমকোর্ট অসমের জন্য তা প্রযোজ্য বলে জানিয়েছিল।

(৪) রাজ্য সরকারকে ফরেনার্স ট্রাইব্যুনালের পরিকাঠামো পরিপূর্ণ করতে হবে। ট্রাইব্যুনাল সুচারুরূপে চালানোর জন্য শূন্য পদে নিয়োগ করতে হবে।

(৫) ফরেনার্স ট্রাইব্যুনালে বিদেশী ঘোষিত ব্যক্তিকে আটক করা এবং তার নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার কাজ তৎক্ষণাৎ করতে হবে। কিন্তু কোর্টের অভিজ্ঞতা হলো, কোনও বাংলাদেশী অভিবাসী বিদেশী ঘোষিত হলে অযথা কালক্ষেপ করা হয় তাকে 'ভারত ছাড়ো' নোটিশ দেওয়া, 'ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়া'-প্রভৃতি কাজে।

ডিভিশন বেঞ্চ আরও বলেছে— "একবার কাউকে অবৈধ বাংলাদেশী ঘোষিত করা হলে তার জন্য আবার আলাদাভাবে 'ভারত ছাড়ো' নোটিশ জারি করার কোনও প্রয়োজন নেই। তাকে তৎক্ষণাৎ আটক করে ডিটেনশন ক্যাম্পে রাখতে হবে এবং ভোটার তালিকা থেকে তার নাম বাদ দিতে হবে।"

"এবার এই বিষয়ে যাবতীয় মামলা পুনরায় নথিভুক্ত করা, বিদেশী ঘোষিত ব্যক্তির আটক, বহিস্কার সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য, গৃহীত ব্যবস্থাদি বিষয়ে পরবর্তী দু'মাসের মধ্যে রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারকে জানাতেই হবে বলে আদালত নির্দেশ দিচ্ছে।

লাগাতার হিন্দুবাড়িতে ডাকাতি ও অত্যাচার চলছে নিম্ন অসমে

নিজস্ব প্রতিনিধি।। নিম্ন অসমের তিন জেলা— কাছাড়, করিমগঞ্জ এবং হাইলাকান্দির মুসলমান প্রধান এলাকা থেকে হিন্দুদের বিতাড়িত করার সুপরিকল্পিত চক্রান্ত চলছে। করিমগঞ্জের পাথারকান্দি থানার দোহালিয়ার গরীব দিনমজুর বিনয় নাথের বাড়িতে একমাসের মধ্যে দু-দুবার ডাকাতির ঘটনা অন্তত সেরকমই ইঙ্গিত করছে। প্রথমবার ডাকাতরা মোবাইল, নগদ টাকা ও অন্যান্য জিনিসপত্র লুটপাট করেছিল। এবার কিন্তু তারা গত ১ ডিসেম্বর রাত্রে কোনও জিনিসপত্র নেয়নি। নেবার মতো কিছু ছিলও না। বিনয় নাথের পুত্র সুজন ওরফে বাপীর সদ্যবিবাহিতা স্ত্রীর শ্লীলতাহানি করেছে। বিনয় নাথের পায়ে ও সুজনের বুকে আগ্নেয়াস্ত্র থেকে গুলি চালিয়েছে। দরজা ভেঙে সুজনের স্ত্রীকে বিবস্ত্র করে। সুজনের মা ও দুইবোন—মঞ্জু (১৮) ও বেবি (১৫) কোনওক্রমে বেরিয়ে যায়। ফলে তারা রেহাই পায়। সুজন একটি ওষুধের দোকানে কাজ করে। তার বিয়ের পর তারই বাড়ির মেয়েদের দিকে দুষ্কৃতীদের কুদৃষ্টি পড়ে। বাবা-ছেলে এসময় শিলচর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

ঘটনার পরদিনই জেলা বিজেপির এক প্রতিনিধিদল প্রাক্তন বিধায়ক সুখেন্দুশেখর দত্তের নেতৃত্বে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। পরে বিজেপির করিমগঞ্জ জেলা সভাপতি জ্যোতির্ময় দাস এক বিবৃতিতে জানান— "হিন্দুদের ভিটেমাটি ছাড়া করার নীল নকশা তৈরি করা হয়েছে। পরিকল্পিতভাবেই হিন্দুদেরকে টার্গেট করা হচ্ছে। হিন্দু মহিলাদের সতীত্ব নষ্ট করে হিন্দুদের গ্রাম ছাড়তে বাধ্য করা হচ্ছে।

বিনয় নাথের বাড়ির ঘটনা থেকে পরিস্কার যে, দুস্কৃতীদের উদ্দেশ্য ডাকাতি নয়, বন্দুকের নলের ডগায় হিন্দুদের ভিটেছাড়া করাই আসল উদ্দেশ্য।" এনিয়ে শ্রী দাস আরও কয়েকটি ঘটনার কথা উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরেন।

২১ নভেম্বর মোকামছড়ার ঝানু দত্তের বাড়িতেও দুষ্কৃতীরা হানা দিয়েছিল। লোথাইরেপোড়া আড়াইঘাটে হিন্দু বাড়িতে ডাকাতি হয়। গত ৩ ডিসেম্বর সংখ্যালঘু অধ্যুষিত হাইলাকান্দি জেলার বক্রিহাওরে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক মণি দাস এবং ট্যাক্স কালেক্টর অপু দাসের বাড়িতে হানা দিয়ে ডাকাতরা সর্বস্ব লুঠ করে নেয়। ইতিমধ্যে বিজেপি-র করিমগঞ্জ জেলার পক্ষ থেকে জেলাশাসককে ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে।

মালদায় দেবদেবীর মূর্তি ভাঙা চক্র সক্রিয়—গ্রেপ্তার দুষ্কৃতি

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ মালদা জেলার বিভিন্ন প্রান্তে হিন্দু দেবদেবীর মন্দিরের ওপর আক্রমণ সম্প্রতি বৃদ্ধি পেয়েছে। সম্প্রতি এক দুষ্কৃতকারীকে হাতেনাতে ধরে ফেলা সম্ভব হয়েছে। গত ২৪ নভেম্বর রাতে চাঁচল ২নং ব্লকের গোবিন্দপাড়া গ্রামের গোবিন্দপাড়া উচ্চ বিদ্যালয় সংলগ্ন মাঠে রাস উৎসবে রাসচক্রের উপরে স্থাপিত মূর্তিগুলি এক দুষ্কৃতি ভেঙে গুড়িয়ে দিয়ে পালাতে গেলে স্থানীয় বনফুল ক্লাবের সদস্যরা ধাওয়া করে ধরে ফেলে। মূর্তি ভাঙার এই ঘটনায় পরদিন সকাল থেকেই স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয় এবং কয়েকশো বাসিন্দা রাস উৎসব চত্বরে জড়ো হয়ে ধৃত দুষ্কৃতির দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাতে থাকে।

ইতিমধ্যে মহকুমা থেকে এস ডি পি ও নিমা নরবু ভুটিয়ার নেতৃত্বে পুলিশ বাহিনী এসে উপস্থিত হয়। দুষ্কৃতির নাম জুনু (জুনিয়ার) শেখ বলে জানা গেছে। সে শিমুলতলার বাসিন্দা ও পেশায় মাংস ব্যবসায়ী। তাকে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে। স্থানীয় মানুষ মনে করে, এই দুষ্কৃতির পেছনে বড় ধরনের মাথা কাজ করছে। কয়েকবছর আগে সরস্বতীর মূর্তি ভাঙা নিয়েও এখানে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। মূর্তি ভাঙার ঘটনায় প্রত্যক্ষদর্শী রাসমেলার দোকানদার নন্দদুলাল দাস ও হীরালাল মণ্ডলসহ বেশ কয়েকজন বলেন, ভোরবেলাতে ওই দুষ্কৃতি রাসচক্রের মূর্তিগুলিকে ঠাণ্ডা মাথায় ভেঙে ফেলে। পালানোর সময় আমরা চিৎকার করি। ক্ষিপ্ত বাসিন্দারা সামান্য মারধর করে তাকে ক্লাবঘরে ঢুকিয়ে রাখে এবং পরে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। স্থানীয় চাঁচল পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য সত্যজিৎ সরকার অভিযোগ করেন, বিষয়টি অত্যন্ত স্পর্শকাতর। পুলিশ ও প্রশাসন যেন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয় ধৃত জুনু শেখকে। মহকুমা পুলিশ অফিসার ভুটিয়াবাবু বলেন, বিভাগীয় অনুসন্ধান শেষে দুষ্কৃতিরা আইনানুগ শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে।

জাল নোটের সবচেয়ে বড় ঘাঁটি মালদহ

নিজস্ব সংবাদদাতা॥ এবছরে ৮ নভেম্বর পর্যন্ত দেশে জালনোট ধরা পড়েছে ২০ কোটি ৪৫ লাখ টাকার মতো। গত বছর ধরা পড়েছিল ২৩ কোটি টাকা। এই বিপুল পরিমাণ জাল নোটের সবচেয়ে বড় ঘাঁটি পশ্চিমবঙ্গের মালদহ। এবছর কেবল মালদা জেলা থেকেই জালনোট ধরা পড়েছে ৩২ লাখ টাকার মতো। গোয়েন্দাদের মতে বাংলাদেশ থেকে সীমান্ত টপকে মালদায় ঢুকছে জালনোট। আর সেই জাল নোট মালদা জেলা থেকে সড়ক এবং রেলপথ হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। তাই আজ যেখানেই জাল নোট ধরা পড়ছে, সেখানেই প্রকাশ হচ্ছে মালদা জেলার নাম। গত ৩০ নভেম্বর ৬ লাখ টাকার জাল নোট নিয়ে মুম্বাইতে ধরা পড়েছিল যে তিনজন তারা মালদার লোক। এদের নাম মহম্মদ রফিকুল ইসলাম, দিলদার হাদি ও সামেদ শেখ।

বাংলাদেশ থেকে জাল নোট এনে এদেশে ছড়িয়ে দেওয়ার কাজ করত এরা। রাজ্য গোয়েন্দাদের মতে মালদায় এই চক্রের মূল চাঁই গুলাম মুর্তাজা। তিনবার জেল খেটে এখন জামিনে মুক্ত। বাংলাদেশ থেকে জাল নোট এনে তার মাধ্যমেই ব্যবসা করছে সে। ১০ কোটি জাল নোট চালাতে পারলে কমিশন থাকে ৬০ লাখ টাকা। মালদার কালিয়াচক, বৈষ্ণবনগর, গোপালগঞ্জ এবং মুর্শিদাবাদের ঔরঙ্গাবাদ জাল নোট চক্রের মূল ঘাঁটি। সেই জাল নোট রামপুরহাট-বর্ধমান হয়ে অন্যদিকে আজিমগঞ্জ কাটোয়া হয়ে হাওড়া এসে পাড়ি দিচ্ছে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে।

মালদা জেলার সীমান্তবর্তী এলাকা কালিয়াচক, হবিবপুর, সুজাপুর, বামনগোলা, মুচিয়াতে প্রতি সপ্তাহে হাট বসে। সেই হাটে হাজার হাজার টাকা লেনদেন হয়। সেখানেই জাল নোট ছড়িয়ে দেবার কাজ চলে। একাজে এক বিরাট চক্র জড়িত। পুজোর আগে পুলিশ এ ব্যাপারে পুরানো মালদা থানার মোহনবাগান গ্রাম থেকে জাহিরুল শেখ নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছিল। জাহিরুলের বাড়ি বাংলাদেশের নবাবগঞ্জ এলাকায়। সে এপাড়ে দেড় লক্ষ টাকার জাল নোট নিয়ে ধরা পড়েছিল। মালদা জেলার বহু মানুষই দিল্লি মুম্বাই হরিয়ানা গুজরাতে জাল নোট পাচার করতে গিয়ে ধরা পড়েছে। মালদা জেলা পুলিশের খবর অনুযায়ী ২০১০ সালের এ পর্যন্ত জালনোট চক্রের সঙ্গে যুক্ত থাকার অপরাধে ৬৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এদের মধ্যে চারজন ছাত্র ও তিনজন মহিলাও ছিল।

উল্লেখ্য মুচিয়া অঞ্চলে ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে যে নদীপথ রয়েছে সেখানে কোনও কাঁটাতারের বেড়া নেই। বর্ষা ছাড়া নদীও শুকিয়ে ছোট হয়ে যায়। এই সুযোগে অনায়াসে এপাড়ে বাংলাদেশিরা ঢুকে পড়ছে। মালদা জেলার ১৭২ কিলোমিটার ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের মধ্যে ৮০ কিলোমিটার সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার কাজ সম্পূর্ণ হয়নি। সেইসব এলাকা শুধু জঙ্গলে ভর্তি হওয়ায় পারাপারের অবাধ সুযোগ রয়েছে। এরমধ্যে কালিয়াচক ও বৈষ্ণবনগর থানার প্রায় ২০ কিলোমিটার এলাকা এবং পুরনো মালদা থানার ৩২ কিলোমিটার সীমান্তবর্তী জলপথ পুরোপুরি উন্মুক্ত থাকায় পাচারকারীদের সুবিধা হচ্ছে। উত্তর পূর্বাঞ্চল রাজ্যের করিডর মালদা। মালদা দিয়েই আসাম নাগাল্যাণ্ড মণিপুরসহ উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে জাল নোট পাচার হয়।

গোয়েন্দাদের মতে আগে ৫০০ টাকার জাল নোট বেশি মিলত। কিন্তু এখন ১০০ টাকার জাল নোট বেশি পাচার হচ্ছে। এত নিখুঁত ও দক্ষতার সঙ্গে জাল নোটগুলি ছাপা হচ্ছে যে অনেক ক্ষেত্রে সন্দেহের কোনও কারণ থাকছে না। এভাবেই উত্তর পূর্বাঞ্চলের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ভেঙে ফেলতে তৎপর হচ্ছে দেশবিরোধী চক্র।

বিহারের নির্বাচনী ফলাফল সবই রামজীকা কির্‌পা

শিবাজী গুপ্ত

বিহারের সাম্প্রতিক নির্বাচনে এন ডি এ-র অভূতপূর্ব ফলাফলে একমাত্র বিজেপি ছাড়া আর সব দলে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। সুতরাং মনের জ্বালা জুড়াতে ছেকুলার মহল ও সোনিয়া গান্ধীর দাসানুদাস সংবাদপত্র টিভি চ্যানেল এই জয়কে নীতিশকুমারের জয় বলে ট্যাঁড়া পেটাতে শুরু করেছে। কিন্তু নীতিশকুমারের জে ডি (ইউ) থেকেও বিজেপি-র ফলাফল যে সকলকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে, সে কথা খোলাখুলি বলতে সংবাদমাধ্যমের কলিজা ফেটে যাচ্ছে। ফলে বিজেপি-র নির্বাচনী সাফল্যকে যতটা পারা যায় লঘু করে দেখাবার আপ্রাণ চেষ্টা চলেছে। সংবাদ- মাধ্যমে শুধু নীতিশ নীতিশ আর নীতিশ, তার ভাষণ, তার ছবিতে পত্রিকার পাতায় ছয়লাপ— অন্য শরিক বিজেপি-র নামমাত্র উল্লেখ থাকলেও সহযোগী সুশীল কুমারের একখানা ছবিও কোনও কাগজে দেখলাম না।

হত্যা করা যদি অপরাধ হয়, হত্যাকে চাপা দেওয়া ডবল অপরাধ। মিথ্যা সংবাদ যদি অপরাধ হয়, সত্য সংবাদকে চাপা দেওয়া দ্বিগুণ অপরাধ। ভারতের সংবাদ মাধ্যম এই অপরাধে অপরাধী। মিথ্যা সাক্ষী দিয়ে স্বয়ং সত্যবাদী ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরও রেহাই পাননি— সোনিয়া-রাহুল গান্ধীর পায়ে মাথা মুড়ানো সংবাদমাধ্যমকেও একদিন নাকে খৎ দিয়ে তাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

ভারতে বাক্ স্বাধীনতা, সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের স্বাধীনতা নিয়ে কতো হামবড়াই করা হয়! সত্যি কথা বলতে গেলে একদা পরাধীন ভারতবর্ষেই সংবাদপত্র মালিক ও সাংবাদিকরা সাংবাদিক সত্যতা ও তেজস্বিতা দেখিয়েছেন। দমনপীড়নকে উপেক্ষা করে জনমতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। দেশবাসীর মৌলিক অধিকারের পক্ষে লড়েছেন। স্বাধীনতার আগে জ্বালাময়ী ভাষায় অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে যেভাবে লড়েছিলেন তাঁরা, সে সোনালী দিন স্বাধীন ভারতে সাংবাদিকতার ইতিহাসে দেখা যাচ্ছে না। পরাধীন ভারতে সংবাদপত্রের মালিকের মালিকানা ফলিয়ে সাংবাদিকদের ওপর লাঠি ঘুরাবার প্রবণতা তেমন দেখা যেত না— সেদিন মালিক নিজেও ছিলেন সাংবাদিক এবং মালিক ও সংবাদকর্মীরা সবাই ছিলেন একই ভাবনায় ভাবিত। অর্থাৎ দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামী স্বদেশপ্রেমিক। সাংবাদিকদের শ্রমিক বলা তাদের মর্যাদাহানিকর বলে মনে করা হোত। ফলে সংবাদপত্র জগতে হুজুর-মজুরের সম্পর্কের কথা ভাবাই যেত না। বহুক্ষেত্রেই তারা ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী কিংবা সংগ্রামের সাথী।

অতীত অতীতেই থাক। বর্তমানে আসি। বিহার-নির্বাচনের ফলাফল যে এন ডি এ-র পক্ষে যাবে সেটা আগেই বোঝা গিয়েছিল। নীতিশ কুমার মুসলমানদের 'ভালো' করার জন্য বহু দৃষ্টিকটু ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। তাছাড়া পাটনায় সমবেত বিজেপি নেতাদের কার্যত অপমানই করেছেন। নরেন্দ্র মোদী ও বরুণ গান্ধীকে বিহারে প্রচারে নামাতে নিষেধ করেছেন। বন্যার্তদের সাহায্যার্থে নরেন্দ্র

সুশীল মোদী

মোদী প্রদত্ত পাঁচ কোটি টাকা ফেরৎ দিয়ে মুসলমানদের মন জয় করেছেন। ফলে মুসলমানরাও জে ডি (ইউ)-কে বদনাভর্তি ভোট দিয়েছে। কিন্তু সে ভোটের কণামাত্রও জোটের অপর শরিক বিজেপি-র বাক্সে পড়েনি। মুসলমানরা বিজেপি-কে ভোট দেবে এমন না-পাক কর্ম তারা জান থাকতে করবে না— তা বিজেপি নেতারা মসজিদ-মাজারেই যান বা ইফতার পার্টিতে মাথায় রুমাল বেঁধেই ঘুরুন।

তা হলেই প্রশ্ন উঠবে বিজেপি এতো ভোট ও আসন পেল কি করে? একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে যে জোটের শরিক হলেও এক্ষেত্রে ধর্মভিত্তিক ভোট বিভাজন ঘটেছে। মুসলমানরা যে সংখ্যায় জে ডি (ইউ)-র দিকে ঝুঁকছে তার চেয়ে বেশি সংখ্যক হিন্দু ভোটার নীতিশের থেকে মুখ ফিরিয়ে বিজেপি-র দিকে ফিরেছে। এবং আখেরে জে ডি (ইউ) থেকে বিজেপি-র লাভের পাল্লা ভারী হয়েছে। শুধুমাত্র রাস্তাঘাট ও আইন-শৃঙ্খলার উন্নতিতে এই অসম্ভব কখনওই ঘটতে পারে না। ভোটারদের মনে জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটেছে বলেই এই আশাতিরিক্ত ফল প্রসব করেছে।

আরও যে ব্যাপারটি বিশেষভাবে লক্ষনীয় তা হলো এবারই বিহারে পুরুষের চেয়ে নারীদের বেশি সংখ্যায় ভোটদান। এটা আইনশৃঙ্খলার উন্নতির সাক্ষ্য তো বটেই তা ছাড়া ধর্মপ্রাণ হিন্দু নারীসমাজের উপর অযোধ্যা মামলার সর্বশেষ রায় প্রবলভাবে পড়েছে। সংবাদ মাধ্যম এসব হিন্দুধর্ম বিশ্বাস যতই চেপে থাকুক না কেন, ধর্মের ঢোল বাতাসে বাজে। রাম-সীতার লীলাক্ষেত্র যখন ঐতিহাসিক পৌরাণিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক স্বীকৃতি পেয়েছে, তাতে হিন্দুমাত্রই উল্লসিত হয়েছে। বেখুশ হয়েছে রামমন্দির বিরোধী অপদার্থের দল।

বিহার নির্বাচন পর্ব তো শেষ হলো। এবার রামের জন্মভূমি খাস অযোধ্যা যে উত্তর প্রদেশে অবস্থিত, সেখানকার শাসনক্ষমতা পুনর্দখল কাজ অসমাপ্ত রয়ে গেছে। বিহারে যেমন রাম-বিরোধী লালু প্রসাদের রাজনৈতিক জীবনের অকাল বিসর্জন ঘটেছে, উত্তর প্রদেশেও রামবিরোধী মুলায়ম— মায়াবতীদের নির্বাসনে পাঠাবার জন্য জোর কদমে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। উত্তরপ্রদেশে যখন এন ডি এ জোটের অস্তিত্ব নেই, তখন রাম নামোচ্চারণে বাধা কি? নরেন্দ্র মোদী ও বরুণকে ময়দানে নামিয়ে দেওয়া হোক। তাতে রাম নামে সব ভূত-মামদো পালাবে। সন্ত তুলসীদাসের অমর সৃষ্টি "রামচরিতমানস" যে অঞ্চলের হিন্দুদের মুখে মুখে ফিরতো, সেই ভক্তি আবার জাগিয়ে তুলতে হবে। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় বলতে গেলে—

"সুপবন বহিতেছে, জাতীয় পতাকা উড়িয়ে দাও— তাতে নাম লেখ— "জয় শ্রীরাম"।

আমেরিকা কোনও দেশের সঙ্গে বাণিজ্য বলতে বোঝে সেই দেশটিকে লুণ্ঠন করা

এন সি দে

আমেরিকা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সমস্ত বস্ত্র বাণিজ্যে কোটা সিস্টেম তুলে দেবে। কিন্তু নানান গাণিতিক ছলচাতুরি দেখিয়ে তা সম্পূর্ণভাবে আজও তোলেনি। গরীব দেশগুলোকে বলছে নিজেদের দেশের কৃষি বাণিজ্যে ভর্তুকি দেওয়া চলবে না। অথচ তারা বছরে ৩০০ বিলিয়ন ডলারেরও বেশী ভর্তুকি দিয়ে চলেছে নিজেদের দেশের কৃষি-বাণিজ্যে। এই হলো ইউরো-আমেরিকান চরিত্র।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক হোসেন ওবামার ভারত দর্শন সমাপ্ত। তিনি ফিরে গেছেন তার দেশের উদ্দেশ্যে, অর্থাৎ তিনি আর এখন আমাদের 'অতিথি দেবতা' নন। তাই এখন স্বচ্ছন্দে তার আর তার দেশের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্কের চুলচেরা বিচার-বিমর্ষ করা যেতেই পারে। তার দেশের যা আন্তর্জাতিক ইমেজ বা ভাবমূর্তি, তাতে ওবামার প্রত্যাগমনও খুব একটা সুখের বা সম্মানের হয়নি। কোনও দেশ তাদের আকাশপথ তাকে ব্যবহার করতে দিতে চায়নি, কোনও কোনও দেশের জনগণ আবার তাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য তাদের দেশের সরকারী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে ফেটে পড়েছে। এ থেকে বোঝাই যায় বিশ্ব-জনগণের নিকট মার্কিন ভাব-মূর্তি কতটা কালিমালিপ্ত।

পুঁজিপতিরা সাধারণতঃ দুই প্রকারের হয়ে থাকে। জাতীয়তাবাদী সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী স্বাধীনচেতা পুঁজিপতি এবং জাতীয় স্বার্থবিরোধী সাম্রাজ্যবাদের দোসর দালাল পুঁজিপতি। বর্তমানে ভারতে এই দালাল পুঁজিপতিদেরই রমরমা, কংগ্রেস দলের মধ্যে এদেরই প্রাধান্য। কংগ্রেস দলের এই পরিণতি অবশ্যম্ভাবী, কারণ বিদেশী দ্বারা গঠিত এই দলের বর্তমান নেতৃত্বও রয়ে গেছে একজন বিদেশিনীর পরিবারের হাতে। এই দল ভারতবর্ষের ক্ষমতায় থাকায় দালাল পুঁজিপতিদের দখলে চলে গেছে দেশের প্রায় সবকটি বৃহৎ বাণিজ্যিক খবরের কাগজ, টিভি চ্যানেলের মতো গণমাধ্যমগুলি। এই গণমাধ্যমগুলির সাহায্যে দালাল পুঁজিপতিদের প্রতিভূরা ওবামার চলন, বলন, কথন প্রভৃতি নিয়ে এরকম স্তুতি করেছে যাতে করে ওবামা প্রীতি কার্যত মার্কিন-প্রীতিতে পরিণত হয়েছে। যাতে করে মনে হয় ওবামা ভারতে এসেছে এদেশের মঙ্গলের জন্য। ভারতে বাণিজ্য করাটা যেন তার স্বার্থে নয়, ভারতেরই স্বার্থে। এই কথাটি যে কতখানি অসত্য তা দেখানোই এই লেখাটির উদ্দেশ্য।

মার্কিন-বানিয়া বৃত্তির ভিত্তি হলো তাদের রাষ্ট্রীয় দস্যুগিরি বা লুণ্ঠন প্রক্রিয়া। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিণতিতে তার অধীন জাতি-রাষ্ট্রগুলি একে একে স্বাধীনতা লাভ করার পর থেকে হীনবল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের হারানো জায়গাগুলি একে একে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা দখল করে ফেলে। মার্কিন বাণিজ্যের নামে লুণ্ঠনের সেই শুরু। তারপরের ইতিহাস শুধুই লুণ্ঠন ঠাসা। আসুন সেই ইতিহাসের পাতা খুলি।

এই ইতিহাসের পাতা থেকে এটা প্রমাণ করা যায় যে আমেরিকা-সহ সমস্ত উন্নত দেশই তাদের নিজেদের আর্থিক সঙ্কট চিরকালই কোনও না কোনও উপায়ে গরীব অনুন্নত দেশগুলোর উপর চাপিয়ে দিয়েছে। স্মরণ করুন তিরিশের দশকের ভয়াবহ আর্থিক সঙ্কটের কথা, যখন পাশ্চাত্যের এই শক্তিমান দেশগুলো তৃতীয় বিশ্বের দুর্বল দেশগুলোর বিশাল বাজারকে লুণ্ঠন করার উদ্দেশ্যে ব্রেটন উড সম্মেলন ডেকেছিল। এই সম্মেলনে তিনটি নয়া প্রতিষ্ঠান গড়া হয়েছিল— আই এম এফ, আই বি আর ডি এবং আই টি ও। সময় জুলাই, ১৯৪৪। ইউ এন ও'-র মতো প্রতিষ্ঠান থাকা সত্ত্বেও কেন প্রয়োজন হয়েছিল এই নতুন তিনটি প্রতিষ্ঠান গড়ার? উল্লেখ করা যেতে পারে যে ইউ এন ও 'এক রাষ্ট্র, এক ভোট' নীতিতে গঠিত। এই নীতিতে গঠিত ইউ এন ও-কে ইঙ্গো-মার্কিন মাতব্বররা পছন্দ করছিল না। এদের ইচ্ছা অনুসারে গঠিত হলো নয়া তিনটি প্রতিষ্ঠান যাদের ভিত্তি হলো 'অর্থ' অর্থাৎ যে দেশ যত টাকা সদস্য চাঁদা দেবে, সেই দেশের ভোটাধিকার তত বেশী।

এই নয়া ভিত্তি ছিল বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ 'কেইন্‌স'-এর মস্তিত্ব-প্রসূত। যেখানে আর্থিক দম্ভটাই মুখ্য, সেখানে আর্থিক দম্ভকে ভিত্তি করে দুনিয়াকে তারা লুণ্ঠন করবে এটাই তো স্বাভাবিক। এই পরিষ্কার অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে 'আই বি আর ডি'-কে পুনর্গঠিত করে গড়া হলো ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক (অর্থাৎ বিশ্ব ব্যাঙ্ক) যাতে গরীব দেশগুলোকে ঋণের জালে আটকে ফেলা যায়। আই টি ও-কে গুটিয়ে ফেলা হলো কারণ এই প্রতিষ্ঠানটি এমন সব বাণিজ্যনীতি তৈরি করছিল যেগুলি মার্কিন ও ইউরোপিয়নভুক্ত দেশগুলোর স্বার্থ বিঘ্নিত করছিল। আই টি ও-র জায়গায় গড়ে তোলা হলো গ্যাট। এটি একটি বহুপাক্ষিক বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান। ছোট ছোট গরীব দেশগুলোকে বহুপাক্ষিক বাণিজ্য ও মাসুলের জালে আবদ্ধ করে ফেলা হলো।

বেশ কিছু বছর চলার পর পুনরায় ৮০'-র দশকের গোড়ায় আমেরিকা গভীর আর্থিক সঙ্কটে নিমজ্জিত হলো। স্বাভাবিক ভাবেই আবার শুরু হলো ষড়যন্ত্র। গরীব দেশগুলোর ঘাড়ে তাদের আর্থিক সঙ্কট চাপিয়ে দেওয়ার ফন্দি-ফিকির। এবার শুরু হলো গ্যাটকেই বিদায় দেবার পালা। চাই নতুন অস্ত্র। গ্যাট বিদায়ের কাজটা করা হলো গ্যাটেরই ডাইরেক্টর জেনারেল আর্থার ডাংকেলকে দিয়ে। তাকে দিয়ে বানানো হলো গ্যাটের অষ্টম চুক্তি যার মধ্যে ঢোকানো হলো কৃষি পরিষেবা, বিনিয়োগ, মেধা সম্পদ স্বত্ত্ব প্রভৃতিকে। এই চুক্তিই হলো গ্যাটের ফাইনাল চুক্তি বা ডাংকেল প্রস্তাব। এই ষড়যন্ত্রের নবতম সংযোজন ডব্লু টি ও যা জন্ম নিল ১৯৯৫ সালে। ডব্লু টি ও'র পুরো নাম ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন; আসলে এটি হচ্ছে ওয়েস্টার্ন ট্রেড অর্গানাইজেশন কারণ এই প্রতিষ্ঠানটির কাজই হলো পাশ্চাত্যের দেশগুলোর বাণিজ্য-স্বার্থ দেখা। দুর্বল দেশগুলোর বাজার অর্থনীতি দখল করা। ইউরোপ ও আমেরিকা দাবি তুললো দেশীয় বাজার বলে কিছু রাখা চলবে না— সব দেশের বাজারই হবে বিশ্ববাজারের অন্তর্গত। নিজের খুশিমতো চুক্তিকে কোনও দেশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য করা চলবে না। সমস্ত বাণিজ্যচুক্তি হবে বহুপাক্ষিক অর্থাৎ সকলের জন্য সমান। এ সমস্তই শুনতে ভাল। বাস্তবিক ভিত্তি নেই। কারণ কোনও দুর্বল দেশ কখনওই শক্তিধর দেশগুলির সমান হতে পারে না।

ডব্লু টি ও বিধান দিল আমদানি শুল্ক ক্রমশঃ কমিয়ে আনতে হবে এবং ভবিষ্যতে তা একেবারে তুলে দিতে হবে। এর উদ্দেশ্য হলো গরীব দেশগুলোর বাজারে কম দামী ইউরো-আমেরিকান পণ্যে ভরিয়ে তোলা। আর অন্যদিকে এই কম দামী পণ্যের সঙ্গে যাতে প্রতিযোগিতায় টিকতে না পারে তার জন্য ডব্লু টি ও'র মাধ্যমে বিধান দেওয়া হলো যে সরকারের তরফে কোনও পণ্যে ভর্তুকি দেওয়া চলবে না। গরীব দেশগুলোর বিরুদ্ধে এ হলো দ্বিমুখী আক্রমণ। আর আমাদের রপ্তানী বাণিজ্যের উপর চাপানো হচ্ছে নানান নিষেধাজ্ঞা যেমন শিশু-শ্রমিক নিয়োজিত কোনও শিল্পদ্রব্য রপ্তানী করা যাবে না;বায়ু-দূষণমুক্ত শিল্পের উপর নিষেধাজ্ঞা, যাতে কয়লা ব্যবহারে কার্বন নির্গমন বন্ধ করতে বিদেশের কাছ থেকে পরমাণু যন্ত্রপাতি কিনতে বাধ্য হয়।

এই লেখাটির উদ্দেশ্য যেহেতু কেমন করে বাণিজ্যের নামে আমেরিকা গরীব দেশগুলোকে লুণ্ঠন করে তা দেখানো, সেহেতু ডব্লু টি ও'র ইউরো-আমেরিকান লুণ্ঠনের

একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। তবে এ প্রসঙ্গটি যতটা সম্ভব ব্যবহার করছি শুধু ইউরো-মার্কিনীদের বাণিজ্যের নামে লুণ্ঠন করার প্রক্রিয়াটি বোঝানোর জন্য। ডব্লু টি ও-র গঠনের সময় আমেরিকা সব দেশকে জ্ঞান দিয়েছিল তাদের নিজ নিজ দেশের আইনকে ডব্লু টি ও অনুসারি করে তৈরি করার জন্য। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার হলো আমেরিকা ডব্লু টি ও গঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজের দেশের আইনটি সংশোধন করে এই কথাগুলি ঢোকানো হলো— "ডব্লু টি ও'র বহুপাক্ষিক বাণিজ্য-বিধানের সঙ্গে যদি মার্কিন আইনের কোনও অসংগতি দেখা দেয় তাহলে মার্কিন আইনই বহাল থাকবে।" বুঝুন এদের দ্বিচারিতা।

এদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি শিয়ালের প্রতিশ্রুতি। কেবল আশু-সমস্যা থেকে বাঁচার প্রতিশ্রুতি। যখনই সমস্যা থেকে বেঁচে গেছে, তখনই পুনরায় ধরেছে রুদ্ররূপ। ভারতের মাটিতে এসে আমাদের প্রধানমন্ত্রীর পিঠ চাপড়াচ্ছে— রহস্য করে বলছে তারা নাকি দেখতে চায় ভারত নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী সদস্যপদ লাভ করছে। দালাল পুঁজিবাদীদের সংবাদপত্র ও দল এটাকে আমেরিকার প্রতিশ্রুতি বলে প্রচার করছে। বছরের পর বছর ধরে পাকিস্তান ও কাশ্মীর প্রশ্নে মদত না দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েও তারা রক্ষা করেনি। তবু আমাদের সরকার ও সংবাদ মাধ্যমগুলি সমানে মার্কিন ভজনা করে চলেছে। আজও ইউরো-মার্কিন বাজারে ভারতীয় কৃষিজাত ও তুলা জাতীয় পণ্য ঢুকতে পারছে না। তারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সমস্ত বস্ত্র বাণিজ্যে কোটা সিস্টেম তুলে দেবে। কিন্তু নানান গাণিতিক ছলচাতুরি দেখিয়ে তা সম্পূর্ণভাবে আজও তোলেনি। গরীব দেশগুলোকে বলছে নিজেদের দেশের কৃষি বাণিজ্যে ভর্তুকি দেওয়া চলবে না। অথচ তারা বছরে ৩০০ বিলিয়ন ডলারেরও বেশী ভর্তুকি দিয়ে চলেছে নিজেদের দেশের কৃষি-বাণিজ্যে।

এই হলো ইউরো-আমেরিকান চরিত্র। কিন্তু এত করেও তারা আর্থিক সঙ্কট এড়াতে পারেনি। ২০০৮ সালের সেপ্টেম্বর থেকে

(এরপর ৯ পাতায়)

আন্তর্জাতিক

চীনকে চেনা এবং চিনিয়ে দেওয়া

তরুণ শাণ্ডি ল্য

কয়েক দশক আগে খবরের কাগজে লেখা হোত 'হিন্দী-চিনি ভাই ভাই'। আমাদের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নেহরুজীর আমলে পঞ্চ শীল নীতির ছোঁয়ায় মনে হয়েছিলো 'সব ঠিক হ্যায়।' গত শতাব্দীর পাঁচের দশক বিদায় নিলো পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার গোড়াপত্তন করে। এই পরিকল্পনার পথ ধরে ভারত এগোতে লাগলো উন্নয়নের পথে। কৃষির উন্নতির সাথে সাথে গড়ে উঠতে লাগলো দেশের বিভিন্ন জায়গায় কল-কারখানা। সেচ ব্যবস্থা এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন, যোগাযোগ ব্যবস্থাকে লক্ষ্য রেখে রূপায়িত হতে লাগলো বহুমুখী নদী পরিকল্পনা।

বাংলায় একটা কথা আছে— পরশ্রীকাতরতা। কথাটির সত্যতা অক্ষরে অক্ষরে জানান দেয়। ভারত স্বাধীনতা লাভ করে ১৯৪৭ সালে। চীন স্বাধীন হয় ১৯৪৯ সালে। সুতরাং উন্নতির প্রস্তুতি পর্ব থেকেই প্রতিযোগিতার তাগিদ থাকাটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু 'অন্যকে পিছনে টেনে দিয়ে আমি দৌড় জিতবো' মনোভাব যদি প্রতিযোগীর থাকে তাহলে সে নানাভাবেই নানারকম কৌশল অবলম্বন করবে। এজন্য অনেকে বলে— মানুষ জন্মসূত্রেই হিংসুটে প্রাণী। চীন বেমালুম ভুলে গেলো কোটনিস মিশনের কথা। কিন্তু আমরা হৃদয় দিয়ে মনে রেখেছি 'ফেরে নাই শুধু একজন।'

সুযোগসন্ধানী কেবল সুযোগ খোঁজে। তিববতে ঘটলো রাহুগ্রাস। একেবারে পূর্ণগ্রাস। চীনা ড্রাগনের কাছে হেরে গেলো তিববতি ড্রাগন। চতুর্দ্দশ দালাইলামা কোন ও রকমে মাংপো নদীর পাড় দিয়ে উঠলো ভারতের অরুণাচলে। দালাইলামা হলো ভারতের আশ্রয়প্রার্থী। চীন করলো গোঁসা। ড্রাগন ভিতরে ভিতরে ফুঁসতে লাগলো। দালাইলামাকে পাকড়াও করা গেল না। ফাঁকি দিয়ে ঢুকে পড়লো ভারতের

ওয়েন জিয়াবাও

অরুণাচলে— সুতরাং, 'অরুণাচল আমাদের চাই'। এতে পাঞ্চে ন লামার কোনও রকম যোগসাজশ ছিলো কি না স্পষ্ট নয়। এপ্রসঙ্গে আরও একটি কথা উল্লেখযোগ্য।

দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস বলেছিলেন— 'দেশ স্বাধীন হবার পরও পনের বছর রাখতে হবে মিলিটারি নিয়ন্ত্রণাধীনে। জওয়ানদের দিয়েই দেশ গড়ে তুলতে হবে। শিল্প কারখানার উন্নতি ঘটাতে হবে তাদের দিয়েই। তারা সবকিছু প্রতিরক্ষারই কাজ করবে।' ভাবলে অবাক হতে হয় ১৯৪৭ থেকে ১৯৬২, পোনের বছরের পথ। এই কথারই পুনরাবৃত্তি শুনেছিলাম শৌলমারি আশ্রমের সাধু মহারাজের কাছে। ছয়ের দশকের প্রথম দিকে ফালকাটার এই আশ্রমটি ছিলো জমজমাট।

যাই হোক, ১৯৬২ সালের চীনা আগ্রাসনকে কে, কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন জানি না, তবে ভারতের উন্নতির পদক্ষেপে বাধা প্রদান এবং দালাইলামাকে ভারতে আশ্রয় দেওয়ার মধ্যেও সুপ্ত কারণ রয়েছে। ফল স্বরূপ অরুণাচলের বেশ কিছু অঞ্চ ল এবং আকসাই চীন সিল্ক রুটের দোহাই দিয়ে এখনো চীনের কব্জায়। একই সঙ্গে দোসর হিসাবে বেছে নিয়েছে ভারতের প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তানকে। থিয়োরিটা হলো— 'তোমার যে প্রতিবেশী সে তোমার শত্রু;কিন্তু তার যে প্রতিবেশী সে তোমার মিত্র।' সমস্ত খবরাখবর সেখান থেকেই পাওয়া যাবে।

চীন সাহায্যের হাত বাড়িয়ে পাক-অধিকৃত কাশ্মীরে রাস্তা তৈরি করে দিয়েছে, যাতে ইসলামাবাদ দিয়ে অধিকৃত তিববত হয়ে মোটর যোগে বেজিং পৌঁছানো যায়। ইদানিং কালে পাক-অধিকৃত কাশ্মীরে এবং লাদাখ সীমান্তে চীন কিছু ঘাঁটিও তৈরি করেছে বলে বিভিন্ন সূত্রে প্রকাশ। এছাড়া, জম্মু-কাশ্মীরের ভারতীয় পাসপোর্টধারীদের চীন পৃথক চীনা কাগজে ভিসা দেওয়ার পদ্ধ তি শুরু করেছে।

এটাকে মোটেই শুভ সংকেত বলা যায় না। এমন কি চীনা কর্তৃপক্ষ ভারতের উত্তরাঞ্চ লীয় বাহিনীর নর্দার্ন আর্মির অধিনায়ক লেঃ জেনারেল বি এস জসওয়ালকেও ভারতীয় পাসপোর্ট থাকা সত্ত্বেও ভিসা প্রদানে অস্বীকৃতি জানিয়ে চীনা কাগজের উপর তাঁকে ভিসা প্রদানের প্রস্তাব দেয়। এর কারণ, তিনি জম্মু-কাশ্মীরে সামরিক অধিনায়কের দায়িত্ব পালন করেন। ঘটনাটি দিল্লীর জন্য এবং দেশের জন্য লজ্জাজনক এবং অপমানজনক। অতীতে অরুণাচলের সাংসদকেও ভারতের সাংসদ টিমে চীনে যাবার সময় বেজিং আপত্তি জানিয়েছিল।

তবে, আশার কথা প্রভাতী দৈনিকগুলির ৩০ অক্টোবরে প্রথম পৃষ্ঠার খবর "অরুণাচল ও কাশ্মীর নিয়ে চীনকে কড়া বার্তা ভারতের।"

নোবেল জয়ী লিউ জিয়াওবো

রিপোর্টে প্রকাশ— 'এক সপ্তাহ পরেই আসছেন বারাক ওবামা।'

আর তার আগেই গত ২৯ অক্টোবর চীনের রাষ্ট্রপ্রধান ওয়েন জিয়াবাওকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিয়েছেন, 'ভারতের স্পর্শকাতর বিষয়গুলি নিয়ে চীন যেন এবার থেকে সংবেদনশীল মনোভাব নিয়ে এগোয়।' এই কথাগুলির মধ্যে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং প্রধানত অরুণাচল এবং জম্মু-কাশ্মীরের কথাই চীনা প্রধানমন্ত্রীকে জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন ভারতের জাতীয় আবেগের কথা।

মার্কিন রাষ্ট্রপতি বারাক ওবামার ভারত সফরের প্রাক্-মুহূর্তে ভারতের এই কড়া বার্তা দেশের ভিতরে এবং বাইরে ভারতকে শক্ত ভিতের উপর প্রতিষ্ঠিত করলো। হ্যানয়ে অনুষ্ঠিত পারস্পরিক সাক্ষাৎকারে চীনকে জানিয়ে দেওয়া হলো যে— 'চীনের অর্থনীতির সঙ্গে ভারত এখন পাল্লা দিয়ে চলতে পারে। পশ্চি মী দুনিয়ার তাবড় তাবড় দেশ চীনের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পেরে না ওঠে সমীহ করে চললেও ভারত তাদের দলে নেই। ভারত শুধুমাত্র দায়িত্বশীল প্রতিবেশী হয়েই থাকতে চায় এবং সকলের সঙ্গেই সুসম্পর্ক চায়। তবে সেটা জাতীয় সার্বভৌমত্বের বিনিময়ে নয়।

আর কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই ওয়েন জিয়াবাও ভারত সফর করবেন। হ্যানয়ের ৪৫ মিনিটের বৈঠকে চীনা প্রিমিয়ার প্রধানও আর্থিক নীতি এবং বাণিজ্য উদ্যোগের আদান-প্রদান সংক্রান্ত বিষয়কে গুরুত্ব দিলেও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং সীমান্ত সমস্যাকেও সামনে এনেছেন। তিনি দুটি বিষয় সরাসরি তুলে ধরেছেন।

প্রথমতঃ কাশ্মীরের বাসিন্দাদের যেভাবে চীন পাসপোর্ট ভিসা না দিকে পৃথক কাগজে ভিসা ইস্যু করছে ভারত তা মেনে নিতে পারছে না। দ্বিতীয়তঃ— অরুণাচল প্রদেশে বারবার চীনা বাহিনীর আগ্রাসন তথা চীনের মানচিত্রে ওই রাজ্যকে চীনের অন্তর্গত দেখানো হচ্ছে সেটাও আপত্তিকর।

অবশ্য, এই দুটি ইস্যুই ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী কূটনৈতিক প্রোটোকল রক্ষা করেই তুলে ধরেছেন। পক্ষান্তরে, চীনের তরফে 'প্রধান ইস্যু' হলো শান্তি পুরস্কারে ভূষিত নোবেল জয়ী চতুর্দ্দশ দালাইলামা। ভারতের মাটিতে তাঁর রাজনৈতিক আশ্রয় এবং ভারতের তিববত নীতি যে চীন পছন্দ করে না, সে কথাও ভারতকে বোঝানো হয়েছে।

বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিত বিচার করলে একটা কথা বারবার সামনে আসে সেটা হলো চীনের মানবাধিকার কর্মী লিউ জিয়াওবো-র নোবেল শান্তি পুরস্কারের ব্যাপারে চীনা কর্তৃপক্ষ মোটেই খুশী নয়। একই সঙ্গে ভারতীয় উপমহাদেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হোক তাও তারা চায় না।

বাংলাদেশে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনও হয়তো চীনের না-পসন্দ। সাহায্যের নামে শ্রীলঙ্কায় উন্নততর বিমানঘাঁটি নির্মাণ ও অন্যান্য পরিকল্পনার বাস্তবায়নও ভারতের সুরক্ষার জন্য চিন্তার কারণ।

নেপালের বর্তমান রাজনৈতিক সঙ্কট এবং একটি মাওবাদী দলের গোপনে চীন সফর ভবিষ্যতে কি অবস্থার সৃষ্টি করবে তাও লুকিয়ে আছে ভবিষ্যতের অন্ধকারে।

এতো কিছুর পরেও বলতে হয় চীনকে চেনা এবং চিনিয়ে দেওয়ার কাজও ভারতকেই নিতে হবে। দোস্তী ভালো, কিন্তু দোস্তীর আড়ালে জবরদস্তী কোনদিনই পারস্পরিক সৌহার্দ্য আনতে পারে না।

সেই দেশটিকে লুণ্ঠন করা

(৮ পাতার পর)

দেখা দিয়েছে তীব্র আথিক সঙ্কট। একে একে বড় বড় আর্থিক প্রতিষ্ঠান নিজেদের দেউলিয়া ঘোষণা করেছে। কিন্তু অপর দেশকে ভর্তুকি দেওয়া বন্ধ করতে বলে এখন আমেরিকা ঢালাও আর্থিক সাহায্য দিচ্ছে এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে। অপর দেশকে বাজার উদার করে খুলে দিতে বলে ইউরো-আমেরিকানরা এখন নিজেদের দেশে কোনও পণ্য ঢুকতে দিচ্ছে না। কেন? বরং ভারত ভ্রমণ করতে এসে কোটি কোটি টাকার বাণিজ্য চুক্তি করে গেলেন। আমাদের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী আগেই আমেরিকা গিয়ে করে এসেছেন ২০০ কোটি ডলারের প্রতিরক্ষা চুক্তি। আগেই ৮টি পি-৮১ পসৈডন দূরপাল্লার সমুদ্র পাহারাদারী উড়ো জাহাজ কেনার বরাত দেওয়া হয়ে গিয়েছিল। আরও ৪টি বরাত দেওয়া হলো পরে। এবার আবার করা হচ্ছে ১০০০ কোটি ডলারের পরিকাঠামো ঋণ তহবিল গঠন। মমতার রেল দপ্তরও বরাত দিয়েছে ২০০ কোটি টাকার রেল ইঞ্জিন ক্রয় করার। বাণিজ্য মন্ত্রী দিয়েছে আমাদের বহুমুখী খুচরো ক্ষেত্রকে উন্মুক্ত করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি। প্রতিরক্ষা মন্ত্রকও পরমাণু সনদে সই করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে দিয়েছে। দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য-চুক্তি যারা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল আজ তারাই একে একে ভারতের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি করে চলেছে।

ভারত-ইতালী, ভারত-জাপান, ভারত-ফ্রান্স ইত্যাদি ইউরোপীয় এবং মার্কিন কব্জায় থাকা দেশগুলি ভারতের সঙ্গে চুক্তি করছে। আগামী পাঁচ বছরে ইউ কে ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য করবে ২৪০০ কোটি ডলারের অথচ এই ইংরেজরাই ওদের দেশে আমাদের ওষুধ ঢুকতে দিচ্ছে না নানান অজুহাতে। ভারতের সঙ্গে ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন-এর চুক্তি হতে চলেছে। চুক্তি হলে এক লাফে ওদের বাণিজ্য বেড়ে যাবে ৭৫০০ কোটি ডলার।

কংগ্রেসের ভারত এই ভাবেই নিজেকে আত্মাহুতি দিয়েছে বিদেশের স্বার্থে। জাতীয় প্রীতি, জাত্যাভিমান সব জলাঞ্জলি দিয়েছে। কংগ্রেসের হাতে ভারতের গৌরব কখনই সুরক্ষিত নয়। সব কিছুই প্রমাণ করা যায় না। কিন্তু অনুমান করা যায়। ভারতের সাধারণ মানুষ অনুমান ব্যক্তও করে ফেলেন যে এরা সি আই এ কিনা জানি না, তবে বিদেশের দালাল।

বিহারের নির্বাচনের ফল

অবিশ্বাস্য ফল ফলেছে বিহার বিধানসভার নির্বাচনে। তিন-চতুর্থাংশ আসনে জয়লাভ করে ৮৪.৭ শতাংশ আসন নিয়ে এন ডি এ জোট সারা ভারতকে চমকে দিয়েছে। জে ডি ইউ ১১৫, বিজেপি ৯১, আর জে ডি ২২, এল জে পি ৩ এবং কংগ্রেস ৪টি আসন লাভ করেছে। বামপন্থীরা (সিপিআই) মাত্র ১টি আসন পেয়েছে। সোনিয়া পুত্রের ম্যাজিক বিহারের মানুষ প্রত্যাখ্যান করেছে। আমি সাধারণ শিক্ষিত বিহারীদের সাথে কথা বলে বুঝেছি তারা জয়প্রকাশ নারায়ণ, কর্পূরী ঠাকুরদের প্রতি কত শ্রদ্ধাশীল। তারই প্রতিফলন ঘটেছে এবারের বিহারের নির্বাচনে। লালুপ্রসাদ যাদব ও রামবিলাসরা বিহারের অপশক্তি। আর বিজেপি-র নেত্রী শ্রীমতী নটরাজন বলেছেন Congress is the mother of all corruption। কারণ কংগ্রেস আজ আবার চারিদিকে অসংখ্য একটার পর একটা আর্থিক কেলেঙ্কারীতে জড়িয়ে পড়েছে। বোফর্স কেলেঙ্কারীতে ৬৫ কোটি টাকা আর আজ স্পেকট্রাম, কমনওয়েলথ গেমস, এল আই সি-র ব্যাঙ্ক লোন ইত্যাদিতে হাজার ২ কোটি টাকা সোনিয়া ও মনমোহনের অপশাসনে চলছে। সর্বোচ্চ আদালত মনমোহন সিংকে কড়া সমালোচনা করেছেন স্পেকট্রাম ইস্যুতে। সোনিয়া বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী সব সমালোচনার উর্দ্ধে। বাঃ চমৎকার! শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল। মাসের পর মাস সে কেলেঙ্কারী চলছে এবং এ রাজা বলেছেন, সব প্রধানমন্ত্রী জানেন, তাহলে রহস্যটা কী তা ভারতের জনতার জানার অধিকার নেই? জয়েন্ট পার্লামেন্টারী কমিটি অবশ্যই করতে হবে। বাজপেয়ীজী তো তৎকালীন স্পেকট্রাম মন্ত্রী প্রমোদ মহাজনকেও সরিয়ে দিয়েছিলেন কেউ কোনও অভিযোগ করার পূর্বেই। মনমোহন তো সেই দৃষ্টান্ত রাখতে পারেননি।

তাই অবিলম্বে জে পি সি তদন্ত কমিটি গড়া হোক এবং দোষীদের শাস্তি দেওয়া হোক।

—বৈদ্যনাথ ঘোষ, নপাড়া, বারাসাত, উত্তর ২৪ পরগণা।

কমনওয়েলথ গেমস

'এলোমেলো করে দে মা, লুটে পুটে খাই'—এই আদর্শকে সামনে রেখে যে দল 'গণতান্ত্রিক রাজতন্ত্র' বহাল রেখেছে তার নাম কংগ্রেস। ভারতমাতাকে ছিন্ন-ভিন্ন করে হলেও লাখো উদ্বাস্তুর রক্তস্রোতের উপর ক্ষমতার নৌকা ভাসিয়ে যে নেহেরু ক্ষমতায় বসতে বদ্ধপরিকর হন, সেই দলের নিকট স্বচ্ছতা আশা করা বাতুলতা মাত্র। জনগণের টাকায় করা যে কোনও প্রকল্পের সঙ্গে এরা গান্ধী পরিবারের নাম জড়িয়ে দেন। গান্ধী পরিবারের নামে যে সব সরকারি প্রকল্প চলছে তার মাধ্যমে সরাসরি কংগ্রেস দলকে সুবিধা পাইয়ে দেওয়া হচ্ছে না কি? নির্বাচন কমিশন কী বলেন? এর বিরুদ্ধে কোনও জনস্বার্থ মামলা বা অন্য কোনও মামলা কেন করা হচ্ছে না?

কমনওয়েলথ গেমস আয়োজন আসলে কং দলের ওয়েলথ্ বাড়ানোর একটি মহা খাওয়া-খাওয়ি উৎসব! কলমডির কলম দিয়ে লক্ষ কোটি টাকা নিশ্চয়ই মিলেমিশেই খাওয়া হয়েছে। কংগ্রেস তার আদর্শায়িত পথেই 'আদর্শ' আবাসন কেলেঙ্কারি করেছে। বোফর্সসতী সনিয়া গান্ধী স্বামীকে বাঁচাতে সতীর কাজই করেছেন! এ রাজা টু-জি স্পেকট্রাম নিয়ে রাজকীয় ভাবেই দু লক্ষ কোটি টাকা হাতানোর ব্যবস্থা করেছেন।

ওহে অন্ধ বোকা ভারতবাসী—তোমাদেরকে বিশ্বকবির ভাষায় বলি,—

দোহাই তোদের একটুকু চুপ কর,
লুটে-পুটে খেতে মোরে দে অবসর...।

—অপরাজিতা দেবনাথ, শেঠ কলোনী, কালিয়াগঞ্জ, উঃ দিনাজপুর।

অরুন্ধতী-গিলানীদের ভারতবিরোধী বক্তব্য

১ নভেম্বর ২০১০ তারিখের স্বস্তিকায় প্রকাশিত অরুন্ধতী রায় ও সৈয়দ আলি শাহ গিলানীর ভারত বিরোধী বক্তব্যের খবর পড়ে আশ্চর্য হচ্ছি, আমরা কোন্ দেশে বাস করছি? এদেশে যে কেউ ইচ্ছামত রাষ্ট্র বিরোধী কাজ করতে পারে, আর রাষ্ট্র তার বিরুদ্ধে কোনওরূপ ব্যাবস্থা গ্রহণ করতে অনীহা প্রকাশ করে।

যে লেখিকাকে সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কৃত করল, সেই লেখিকার মুখ থেকে কি করে রাষ্ট্র বিরোধী কথা বের হয়? কাউকে এ ধরনের পুরস্কৃত করার পূর্বে তাঁদের ব্যক্তিচরিত্র, রাজনৈতিক চরিত্র, লেখার বিষয়বস্তুর সঠিক বিচার করে তবেই পুরস্কৃত করা উচিত।

মাওবাদীরা যে কত ভয়ঙ্কর তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ 'নেপাল'। বিশ্বের একমাত্র হিন্দু রাষ্ট্রকে কি ভাবে মাওবাদীরা ধ্বংস করল তা দেখা গেল।

সরকার যেখানে মাওবাদী আন্দোলন দমন করার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করছেন, কত নিরীহ মানুষের প্রাণ যাচ্ছে, কত জওয়ান নিহত হচ্ছেন। এরপর সরকার কি করে মাওবাদীদের প্রকাশ্যে সেমিনার করার অনুমতি দিল? স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে সরকার আদৌ কি মাওবাদীদের দমন করতে চায়? স্বাধীনতার পর কম্যুনিস্টরা প্রকাশ্যে কাজ করতে পারত না কংগ্রেসের ভয়ে। তারা 'আণ্ডারগ্রাউন্ডে' কাজ চালিয়ে যেত। যখন ওদের স্বীকৃতি দেওয়া হলো এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া হলো, সেই দিন থেকেই এদেশের সর্বনাশের পথ প্রশস্ত হলো। আজ ওরা কয়েকটি প্রদেশে দানবীয় শক্তিতে শক্তিমান হয়ে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে।

বিষবৃক্ষ অঙ্কুরেই বিনষ্ট করা উচিত। মাওবাদীদের প্রকাশ্যে খোদ দিল্লীতে ও কাশ্মীরে ভারত বিরোধী বক্তব্য রাখার সুযোগ করে দেওয়ায় উগ্রপন্থীরা উৎসাহিত হবে, ওদের আরও মনোবল বেড়ে যাবে। এধরনের বক্তব্য রাখার অর্থই হচ্ছে উগ্রপন্থী কাজকর্মকে সমর্থন করা।

তাই, প্রশ্ন জাগে অরুন্ধতী রায়, সুজাত রাও এরা কি সত্যিই ভারতীয়? যদি তা না হয় ওদের গ্রেপ্তার করা হোক এবং মাওবাদীদের চিরতরে নিষিদ্ধ করা হোক।

—অনিল চন্দ্র দেবশর্মা, সদস্য, বঙ্গ সংস্কৃতি পরিষদ, কোচবিহার।

অযোধ্যা ঃ প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ

দীর্ঘদিন পরে অযোধ্যা মামলার রায় বের হওয়ার পর থেকে একশ্রেণীর সংবাদপত্র ও বৈদ্যুতিন প্রচার মাধ্যম লাগাতারভাবে এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে যে অযোধ্যা মামলার রায়দানের ক্ষেত্রে এলাহাবাদ হাইকোর্ট কোনওরূপ তথ্য-প্রমাণ নয়, বরং ধর্মীয় বিশ্বাস ও আস্থার উপর নির্ভরশীল হয়ে ও প্রাধান্য দিয়ে এই রায় দিয়েছে। অধিকাংশ রাজনৈতিক দল ও মুসলিম সংগঠনেরও ওই একই বক্তব্য।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, অযোধ্যা মামলার রায় কী শুধু ধর্মীয় আস্থা ও বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে হয়েছে? মোটেই না। অযোধ্যা মামলার রায়দানের ক্ষেত্রে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া (এ এস আই) বা পুরাতাত্ত্বিক সমীক্ষার রিপোর্টের উপর সবচেয়ে বেশি নির্ভর করেছে আদালত। কারণ পুরাতাত্ত্বিক সমীক্ষা সম্পূর্ণভাবে বৈজ্ঞানিক ও বাস্তবধর্মী সমীক্ষা। আদালতের প্রথম প্রশ্নই ছিল—বিতর্কিত সৌধ কোনও মন্দির ভেঙে হয়েছিল কিনা। ওই সরকারি সমীক্ষা রিপোর্টে প্রকাশ পেয়েছে যে সৌধের তলায় দ্বাদশ শতাব্দীর একটি মন্দিরের কাঠামো ছিল এবং মন্দিরের বহু নিদর্শন ও নানাবিধ দ্রব্য-সামগ্রীর সন্ধান মিলেছে, যা থেকে প্রতীয়মান হয় যে মন্দির ভেঙেই তার উপরে বিতর্কিত সৌধ নির্মিত হয়েছে। তাছাড়া বিচারপতি ধরমবীর শর্মা তো বাবরি মসজিদকে মসজিদ বলতেই অস্বীকার করেছেন। কারণ মসজিদের যে পরিকাঠামো ও ব্যবস্থাপনা থাকা উচিত বাবরি মসজিদে তাদের অধিকাংশই ছিল অনুপস্থিত।

অথচ সেকুলারবাদী বিভিন্ন দল ও মিডিয়া ইচ্ছাকৃতভাবে সেসব দিকে নজর না দিয়ে এক চোখা হরিণের ন্যায় বাবরি ধাঁচাকে বাবরি মসজিদ রূপে দেখে আসছে। তারা পুরাতাত্ত্বিক সমীক্ষার রিপোর্টকে পুরোপুরি অবজ্ঞা করে গেছে। এইসব দুষ্টচক্র ও ভণ্ডদের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা হওয়া উচিত। সত্যি বলতে কী, সেকুলারবাদী রাজনৈতিক দল ও মিডিয়া এতকাল রামের অস্তিত্বকেই স্বীকার করেনি। তারা রামকে বলেছে পৌরাণিক তথা কাল্পনিক চরিত্র। কিন্তু আদালতের রায়ে রামের অস্তিত্ব স্বীকৃত হওয়ায় এবং বিতর্কিত জমি রামের জন্মভূমি রূপে ঘোষিত হওয়ায় সেকুলারবাদীরা বেসামাল হয়ে পড়েছেন। তাই প্রকৃত সত্যকে গোপন করে মিথ্যার বেসাতি শুরু করেছেন। বাবরি ধাঁচাকে বাবরি মসজিদ বলে চিল চিৎকার করছেন এবং আস্থা ও বিশ্বাসের গল্প শোনাচ্ছেন। তাঁরা কিন্তু অতঃপর একবারও প্রশ্ন তুলছেন না—মন্দিরের কাঠামোর উপর কেন মসজিদ নির্মাণ করা হলো?

—ধীরেন দেবনাথ, কল্যাণী, নদীয়া।

চালুনির সূচের বিচার

গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির ২৫তম রাজ্য সম্মেলনে রাজ্যের সংস্কৃতি সম্পন্ন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বলেছেন, 'সমাজবিরোধী দল তৃণমূল'। সেই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতেই এই পত্রের অবতারণা। উক্ত সভায় উনি বলেছেন, "রেলমন্ত্রী নিত্যনুতন ট্রেন উদ্বোধন করে বেড়াচ্ছেন। কোথা থেকে সেইসব ট্রেন যায় আসে কেউ জানে না, শুধু খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন।"

তাহলে বলি, যে সব নামের ট্রেনগুলির উদ্বোধন হয়েছে সেগুলির নাম কোথা থেকে ছাড়ে কোথায় যায় তার সব কিছু সময়-সারণীতে (টাইমটেবল) লেখা আছে। বুদ্ধদেববাবু সময় নষ্ট করে একটু দেখে নেবেন।

১৯৭১ সালে ৫ নভেম্বর অর্থাৎ আজ হতে প্রায় ৩০ বছর আগে গোঘাটের বাসিন্দা বাসুদেব হাজরা ও শিবু ডোমের হাত-পা কেটে, পরে মুণ্ডু কেটে তা দিয়ে ফুটবল খেলা হয়েছিল। অভিযোগ হলো—ওদের এই শাস্তির বিধান দিয়েছিল সিপিএম-এর জোনাল কমিটির সম্পাদক অভয় ঘোষ। কাজটা সমাধা করেছিলো নাকি সিপিএমের এক জল্লাদ, নাম—ল্যাড়কা পাত্র। সেই অভয় ঘোষ বর্তমানে আবারও হুমকি দিলেন সিপিএমের কোনওপ্রকার কাজের বিরোধিতা করলে তৃণমূলের আতাউল হকেরও একই পরিস্থিতি হবে।

১৯৭১ সালের ১৭ মার্চ বর্ধমানে সাঁইবাড়ির নারকীয় হত্যাকাণ্ডের কথা সকলেরই জ্ঞাত। বিজন সেতুর উপর অনন্দমার্গীদের যেভাবে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছিল তা বীভৎসতার দিক থেকে ভয়ঙ্কর। বানতলা, ধানতলা যোকসাডাঙ্গা, কেতুগ্রাম, সবং, পিংলায় যারা সন্ত্রাস ঘটিয়ে গ্রামের সকল পুরুষকে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে তারা কি সমাজবিরোধী নয়? হার্মাদ সৃষ্টি করে লালগড়ে ও অন্যান্য স্থানে যারা জনগণকে আতঙ্কিত করে রেখেছে তারা কি সাধু?

মেদিনীপুর জেলা বামফ্রন্টের একসভায় সংস্কৃতিসম্পন্নের ভেকধরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হুঙ্কার ছেড়েছেন "তৃণমূলনেত্রীকে কে বাঁচায় দেখব"। আচ্ছা, প্রথমে উনি মহিলা তারপর ভারতের রেলমন্ত্রী। তাঁর উদ্দেশ্যে এধরনের সমাজবিরোধী মার্কা কথাবার্তা কি করে বুদ্ধদেববাবুরা বলেন? একজন মহিলাকে নিয়ে গোটা সিপিএমের মতো একটি আঞ্চলিক দলের নাভিশ্বাস উঠছে, কি হাস্যকর অবস্থা।

তাই আপনি যখনই তৃণমূলকে সমাজবিরোধী দল বলছেন তখনই আপনার মস্তিষ্ক অসুস্থতার কথা মনে হচ্ছে। আর মনে পড়ছে "চালুনির সূচের বিচার করার কথা।"

—দেবপ্রসাদ সরকার, মেমারী, বর্ধমান।

জন্মশতবর্ষে রামমনোহর লোহিয়া

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের এবং সমাজবাদী আন্দোলনের অকৃত্রিম, একনিষ্ঠ, অক্লান্ত যোদ্ধা রামমনোহর লোহিয়ার জন্মশতবর্ষ নানা সভা, সমিতি ও আলোচনা বৈঠকের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। যদিও প্রচার মাধ্যমগুলো এই সব অনুষ্ঠানের প্রতি কোনোরকম গুরুত্ব দেয়নি! মিডিয়ার এই ধরনের আচরণ বর্তমানে খুবই স্বাভাবিক। কেননা তাদের একমাত্র লক্ষ্য যেন-তেন-উপায়ে অর্থ রোজগার ও অর্থের ভাণ্ডার গড়ে তোলা। দেশবাসীর কাছে, বিশেষ করে নবীন প্রজন্মের কাছে যথার্থ এক দেশভক্ত, আপোষহীন নেতার জীবন ও বাণীকে তুলে ধরা মিডিয়া বর্তমানে অপ্রয়োজনীয় মনে করে।

লোহিয়াজীর জন্ম ২৩ মার্চ, ১৯১০, তাঁর প্রয়াণ ১২ অক্টোবর, ১৯৬৭। মাত্র ৫৭ বছরের জীবন। কিন্তু এই স্বল্প সময়েই দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও তারই আনুষঙ্গিক সমাজবাদী আন্দোলনে বলিষ্ঠ প্রভাব রেখে গেছেন। কোনও ধরনের আপোষের পথে পা মাড়াননি! এই ঋজুতা, সততা লোহিয়াজীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। এই সম্পদ নিয়েই তিনি স্বাধীনতার রণাঙ্গনে এক বীর যোদ্ধা হিসেবে কাজ করে গেছেন। সংগ্রাম সার্থক হয়েছে তাঁর। দেশ পরশাসন মুক্ত আজ।

তাঁর বরাবর একটা ধারণা ছিল দুর্নীতিমুক্ত প্রকৃত চরিত্রবান, অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা আইনসভায় থাকলে অনেক জনকল্যাণমূলক কাজ হতে পারে এবং দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক চিত্র লোকে জানতে ও বুঝতে পারে। নানা বাধা, বিপত্তি, বিরূপতা কাটিয়ে তিনি যখন লোকসভায় এলেন, 'তিন আনা পনেরো আনা' বিতর্কে তিনি তাঁর ধারণা প্রমাণ করলেন। দেশের অধিকাংশ মানুষের আর্থিক অবস্থা কতটা শোচনীয় লোহিয়াজী চোখে আঙুল দিয়ে তা দেখিয়ে দিয়েছিলেন। পার্লামেন্টে লোহিয়াজীর মেয়াদ সামান্যই ছিল। তাই তাঁর বলিষ্ঠ চিন্তা-ভাবনার আরও পরিচয় দেশবাসীর কাছে অজ্ঞাতই রয়ে গেল!

লোহিয়াজীকে প্রথম দেখি ওয়েলিংটন স্কোয়ারে (বর্তমান সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার)। স্কুলের ছাত্র আমি। তাই তাঁর সেদিনের বলিষ্ঠ বক্তব্য সেভাবে বুঝতে পারিনি। তবে একটা জিনিষ পরিষ্কার হয়েছিল। যে আমার সামনের বক্তা ষোল আনার চেয়ে সতেরো আনা খাঁটি এবং তিনি যা বলছেন, বিশ্বাস করেন ও তা কাজে করে দেখান। লোহিয়াজীর ক্ষেত্রে পরবর্তীকালে দেখেছি আমার এই ধারণা অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

লোহিয়াজীর অকাল প্রয়াণ জাতীয় রাজনীতি, সেই সঙ্গে দেশের সমাজবাদী আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক বিরাট ও অপূরণীয় ক্ষতি। স্পষ্ট বক্তা এবং মনেপ্রাণে সমাজবাদী লোহিয়াজীর কিছু কিছু মন্তব্য এক সময় জাতীয় রাজনীতিতে বিতর্কের ইন্ধন যুগিয়েছিল। উল্লেখ না করেও বলা যায় ওনার এইসব অপ্রিয় বক্তব্যের পেছনে গভীর সত্য আছে। তাকে মোটেই অস্বীকার করা যায় না। তাই দেখি নির্ভীক এই মানুষটির আকস্মিক প্রয়াণ সকলের মনে স্পর্শ করে গেছে। তারই প্রকাশ দিল্লী তথা দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাপ্তাহিক পত্রিকা "Organiser"র সম্পাদকীয়-র ক্যাপসন "The Dear Departed" অর্থাৎ "প্রিয় নেতা আর আমাদের মধ্যে নেই।" এই সম্পাদকীয়-র ছত্রে ছত্রে লোহিয়াজীর সংগ্রামী জীবন ও কর্মের প্রতি তথ্যনিষ্ঠ বক্তব্য ও শ্রদ্ধা নিবেদিত হয়েছে। সমসাময়িক ভারতীয় রাজনীতিতে রামমনোহন লোহিয়া সত্যিই এক শ্রদ্ধেয় ও অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব। তাঁর জীবন ও বাণী আজও ভারতের রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে দিক্‌দর্শনের কাজ করতে পারে।

—রণজিৎ কুমার সিংহ, কলকাতা।

পরম্পরা

শ্রীশ্রী মায়ের আলোকে 'মাতৃভাব'

স্বামী প্রভানন্দ

মায়ের সবার জন্য অফুরন্ত স্নেহ ছিল, সে-মাতৃস্নেহ পার্থিব মায়ের স্নেহ থেকে ভিন্ন। শ্রীমায়ের স্নেহ কোনও বন্ধন আনেনি, মুক্তির পথ উন্মোচিত করেছে। ঠাকুরের ভাষায় বলতে হয়— এর মধ্যে মায়া ছিল না, ছিল দয়া। সেখানে আবেগ ছিল, কিন্তু মায়ার দ্বারা এই আবেগ কলুষিত ছিল না। এই ভাবের আবেগ দয়ার দ্বারা পরিশুদ্ধ বলে স্নেহের পাত্রকে মুক্তির পথে নিয়ে গিয়েছিল।

দ্বিতীয়ত, মায়ের ছিল একটি অসাধারণ গুণ— তিনি প্রত্যেক ব্যক্তিকে, প্রত্যেক বস্তুকে তার যথাযোগ্য মর্যাদা দিতেন। আজকের দিনে এবিষয়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিদিন পত্র-পত্রিকায় মানুষের ওপর, বিশেষত নারীদের ওপর আমরা নির্যাতন, লাঞ্ছনা, অবমাননার ঘটনার কথা পড়ি;উপরন্তু যেসব জিনিসপত্র বা যেসব মানুষের সাহায্যের ওপর আমরা নির্ভর করে থাকি— তাদের প্রতি আমাদের উপেক্ষা, অনুদারতা, অসৌজন্যতা যেন বেড়েই চলেছে! এই পরিপ্রেক্ষিতে মায়ের ওই অসাধারণ গুণটি বিশেষ মননযোগ্য।

একদিন শ্রীমা দেখলেন, কাজ হয়ে যেতেই একজন ঝাঁটাটি ছুঁড়ে ফেলল। তিনি ওই ব্যক্তিকে বললেন, ঝাঁটাকেও তার যথাযোগ্য মান্যতা দিতে হয়। তারপর তিনি নিজেই ঝাঁটাটিকে ঠিক জায়গায় তুলে রাখলেন। শ্রীমা পরিবারের প্রত্যেককে কিছু কিছু অধিকার দিয়ে নিজে ছোট হয়ে থাকতেন। একদিনের ঘটনা। নলিনীদি একটু অভিমানী ছিলেন। রাধুর শ্বশুরবাড়িতে তত্ত্ব যাবে, তাতে যদি নলিনীদির হিংসা কিংবা ঈর্ষা হয়, তাই মা হঠাৎ নলিনীদিকে বলছেন ঃ "দ্যাখ তো, এই যে তত্ত্ব পাঠাব ঠিক হলো কিনা?" লিস্টটা দেখেই মুরব্বির মতো নলিনীদি সাগ্রহে বললেন ঃ "একি হচ্ছে, এইটুকু কি? আরও এই এই দিতে হবে।" মা চুপ করে থাকলেন। নলিনীদি যা বললেন, মা তা মেনে নিয়ে কয়েকটি জিনিস তালিকায় জুড়ে দিলেন। আরেকটি ঘটনা। একদিন এক ব্রাহ্মমহিলা ডাক্তার এসেছেন। অন্য সবাইকে মা প্রসাদ দিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মবলে হয়তো প্রসাদ অপছন্দ করবেন ভেবে মা তাঁকে দিলেন না। পরে সেই মহিলা যখন নিজে চাইলেন, তখন মা তাঁকে প্রসাদ দিলেন। সবদিকে তাঁর লক্ষ্য। শ্যামাদাস কবিরাজ এসেছেন। তখনকার দিনে ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ ব্যাপারে সবাই সচেতন। মা রাধুকে বললেন কবিরাজ মশায়কে প্রণাম করতে। মায়ের সঙ্গিনীদের কারো কারো এ-সিদ্ধান্ত পছন্দ হয়নি, কিন্তু মা গুণী ব্যক্তিকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিলেন। প্রত্যেককে যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়া ভারতবর্ষের ঐতিহ্যের মধ্যে রয়েছে। ভাগবতের মধ্যে রয়েছে। সেগুলি আমরা প্রায় ভুলতে বসেছি। কিন্তু মাতৃভাবের পরাকাষ্ঠা শ্রীমা প্রত্যেককে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করেছেন, প্রত্যেক ব্যবহার্য বস্তুকেও মর্যাদা দিয়েছেন।

মা ছিলেন নম্রতার প্রতিমূর্তি। যখন সবাই তাঁকে বড় করে দেখবার চেষ্টা করছে, তিনি সেসময় তাদের বাধা দিয়ে বলছেন— ঠাকুর দয়া করে আমাকে তাঁর পায়ে আশ্রয় দিয়েছিলেন। ঠাকুরের চেয়ে তাঁকে বড় করে দেখাবার প্রত্যেক প্রচেষ্টার তিনি বারবার প্রতিবাদ করেছেন, বিনয়ের সঙ্গে তাঁর নিজের সামান্য ভূমিকা সবার সামনে তুলে ধরেছেন। শুধু তাই নয়। পুরীতে তিনি জগন্নাথ মন্দিরে যাবেন, পাণ্ডা গোবিন্দ সিঙ্গারী নিয়ে যাবেন। ব্যবস্থা করা হয়েছিল, মা পালকি করে যাবেন। কিন্তু মা আপত্তি করলেন, বললেন— না, আমি কাঙালিনীর মতো পায়ে হেঁটে যাব। এসব বিচিত্র সুন্দর আচরণের মোড়কে বিভূষিত মায়ের চরিত্রখানি চিরদিনের জন্য আদর্শ হয়ে থাকবে। শ্রীমায়ের চরিত্রের আরেকটি ভূষণ তাঁর অদোষদর্শিতা। তিনি কারো দোষ দেখতে পারতেন না। স্বামী অভেদানন্দ মাতৃস্তুতিতে বলেছেন ঃ "দোষানশেষান্ সগুণীকরোষি।" তাঁর সন্তানদের মধ্যে কোনও দোষ থাকলে তিনি তার মধ্যেও গুণ দেখতেন এবং সন্তানের সেই দোষের মোড় ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতেন।

আশ্চর্যের বিষয়, মা গ্রামে বড় হয়েছেন, কোনও স্কুল-কলেজে পড়েননি; কিন্তু তাঁর মন ছিল কুসংস্কারমুক্ত, তাঁর আচরণ ছিল যুক্তিনিষ্ঠার ওপর প্রতিষ্ঠিত। নিবেদিতা একদিন নিজে রান্না করে ঠাকুরকে ভোগ দিয়ে প্রসাদ নিয়ে এসেছেন। মা তা গ্রহণ করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে আপত্তি উঠেছে— নিবেদিতা ব্রাহ্মণ নন, হিন্দু নন। মা শান্তভাবে প্রতিবাদ করে বলছেন ঃ "নিবেদিতা আমার মেয়ে, সে ঠাকুরের পুজো করেছে, সেই প্রসাদ আমি গ্রহণ করছি। তাতে যদি কারুর আপত্তি থাকে তা আমি কি করতে পারি?" কী ভীষণ কথা, ভাবলে অবাক হই! আরেকটি ঘটনা। যোগীন-মা কোনও কারণে এক ব্রহ্মচারীর ওপরে খুব চটে গেছেন। তিনি গঙ্গাস্নান সেরে এসে উদ্বোধন বাড়ির নিচে পা ধুচ্ছেন। সেসময়ে যোগীন-মা চিৎকার করে মাকে বলছেন ঃ মা, ওকে তুমি বের করে দাও। ও যদি থাকে তবে আমি এ-বাড়িতে থাকব না। মা বার দুই-তিন শুনে যোগীন-মাকে ওপরে যেতে অনুরোধ করলেন। যোগীন-মা ওপরে গিয়েও হম্বিতম্বি করছেন। মা তাঁকে নানাভাবে শান্ত করার চেষ্টা করছেন। সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে তিনি গম্ভীর হয়ে বললেন ঃ এই ছেলে বাড়িঘর ছেড়ে এখানে এসেছে, আমাকে মা বলে জেনেছে। যোগীন, তোমাকে এত করে বলছি ওকে ক্ষমা করো, ওকে আমি ত্যাগ করতে পারব না। তুমি যা করবার কর। মায়ের এরূপ কঠোর মনোভাব ভাবাই যায় না! এ-ঘটনার উল্লেখ রয়েছে স্বামী নির্লেপানন্দের (যোগীন-মার নাতির) স্মৃতিকথাতে। মাতৃভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত শ্রীমায়ের ছিল স্বচ্ছ দৃষ্টি, যুক্তিনিষ্ঠার দ্বারা পরিশীলিত সংস্কারমুক্ত মন। অসাধারণ!

দক্ষিণ ভারত পরিভ্রমণের সময় মা ব্যাঙ্গালোরে মাত্র তিনদিন ছিলেন। একদিন তিনি দেখছেন, তাঁর ঘরের জানালা দিয়ে উঁকিঝুঁকি মারছে একটি ছেলে। তিনি হাত নেড়ে ডাকলেন। ছেলেটির খালি গা, মাথার চুল উস্কখুস্ক। তিনি তাকে কাছে বসালেন, তার মাথায় খানিকটা তেল মাখিয়ে দিলেন, চিরুনী দিয়ে চুল আঁচড়ে দিলেন। একজনকে বললেন ঃ এই ছেলেটিকে কেউ একটি জামাও দিলে না! শুনে একজন ভক্ত দৌড়ে গেলেন জামাকাপড় কিনতে। মা ছেলেটিকে খাওয়ালেন। পরের দিন তাকে মন্ত্রদীক্ষা দিলেন। সবাই অবাক হয়ে গেল। ছেলেটির নাম আদিমূলম। নিচু জাতের। তার ভাষা মা বুঝতে পারেন না, সেও মায়ের কথা বুঝতে পারছেনা। এদিকে ব্যাঙ্গালোর আশ্রমে তখন ব্রাহ্মণদের আধিপত্য। আর সেখানাকার মানুষের মধ্যে জাতপাতের প্রবল কুসংস্কার। মা সবকিছু অগ্রাহ্য করে তাকে দীক্ষা দিয়েছেন। পরবর্তীকালে এই ছেলেটিকে ভক্তরূপে ব্যাঙ্গালোর আশ্রমে আসতে দেখা গিয়েছিল। মা যেটা উচিত মনে করতেন, সেটা নির্দ্বিধায় করতেন। কিন্তু এমনভাবে বিনয়ের সঙ্গে করতেন যে, কারও মনে আঘাত লাগত না। তাঁর নিত্যকার আচার-আচরণ থেকে বোঝা যেত, জাতপাতের কুসংস্কার কখনওই

শ্রীশ্রীমায়ের ১৫৮তম জন্মতিথি উপলক্ষে প্রকাশিত।

তাঁকে বিচলিত করতে পারেনি।

শ্রীমায়ের দিব্যজীবনে দেখতে পাই দেহলী দীপের আলো। তুলসীদাস রামনামরূপ দেহলী দীপের কথা বলেছেন। দীপ ঘরের দরজার কাঠের ওপর রাখলে ঘরের ভিতরে আলো হয়, বাইরেও আলো হয়। দেহলী দীপের মতো জ্বলছিল তাঁর মাতৃত্বের অনির্বাণ দীপটি। তাঁর স্নিগ্ধ আলোকে আলোকিত মায়ের জীবন। অন্তরে ছিল চিরকালের শান্তি। অশান্তি কাকে বলে তিনি জানতেন না। আর বাইরে বিকীর্ণ মাতৃত্বের আলো ছিল কতকটা যাদুর মতো;তার আকর্ষণে সবাই তাঁর কাছে ছুটে আসত। তিনি সকলের জন্য, তাঁর সন্তানদের কল্যাণের জন্য সবকিছু করতে প্রস্তুত ছিলেন। সন্তানদের কল্যাণের জন্য লৌকিক দৃষ্টিতে তিনি যা যা করেছিলেন, তার তালিকা দেখলে অবাক হতে হয়। এক অত্যাশ্চর্য ব্যাপার!

তাঁর অসাধারণ মাতৃভাবের আলোতে বুঝতে হবে তাঁর বাণীর তাৎপর্য। তাঁর একটি বাণী ঃ "যদি শান্তি চাও মা কারো দোষ দেখো না। দোষ দেখবে নিজের। জগৎকে আপনার করে নিতে শেখো, কেউ পর নয় মা, জগৎ তোমার।" মাতৃভাবের পূর্ণ বিকশিত আলোকে উদ্ভাসিত তাঁর এই বাণী তাঁর সার্বিক অভিজ্ঞতা থেকে উৎসারিত।

আমাদের আশপাশের ও বৃহত্তর পরিমণ্ডলে চোখ মেলে তাকিয়ে দেখি, আমাদের ভারতবর্ষে শতকোটির বেশি মানুষের বাস। তাদের মধ্যে বিরাট এক অংশ ন্যূনতম প্রয়োজনীয় অর্থাৎ খাদ্য, বস্ত্র, গৃহ ইত্যাদি থেকে বঞ্চিত;নিরক্ষরতার অন্ধকারে ও অপুষ্টিজনিত ব্যাধির কবলে পর্যুদস্ত। এদিকে 'মাস মিডিয়া' বা গণমাধ্যমের দৌলতে লোভনীয় পণ্যের রকমারি ভোগ্যের রঙিন চিত্র তাদের চোখের সামনে ঝুলছে। পশ্চিমী ভাবনা গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা আমদানী করে এদেশের মানুষের মধ্যে ভোগাধিকারের তারতম্য বেড়েই চলেছে। পৃথিবীর আর্থসামাজিক মানদণ্ডে উন্নত দেশগুলি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ঝাণ্ডা উঁচিয়ে সাজগোজ করে তাদের দেশবাসীর পুঞ্জীভূত ক্ষোভ, দুঃখ, অশান্তিকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে। বিশ্বায়নের প্রাঙ্গণে সাম্যের বাণী জোর গলায় উচ্চারণ করলেও দুনিয়ার সু-উচ্চ মাত্রায় সম্পদ-ভোগকারী এসব 'উন্নত' দেশ বঞ্চিত তদের মধ্যে সম্পদ বিতরণ করতে নারাজ। বঞ্চিত তদের দাবিয়ে রাখার জন্য যুদ্ধ-ব্যবসায় রমরমা চলেছে, অথচ স্থিরমস্তিষ্কের মানুষ বুঝতে পারছে যে, যুদ্ধ সঙঘর্ষের জন্য নির্ধারিত সম্পদ দিয়ে বঞ্চিত মানুষদের দুঃখকষ্ট দূর করা মানুষের সাধ্যাতীত নয়। সামগ্রিক দৃষ্টিতে বিচার করলে স্পষ্টতই মনে হয়, মানবসমাজ যেন একটা হালভাঙা নৌকার মতো লক্ষ্যচ্যুত হয়ে ভেসে ভেসে চলেছে। অবস্থা বাস্তবিকই সঙ্কটজনক এই কারণে যে, অধিকাংশ মানুষ প্রকৃত পরিস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন নয়। মাতৃভাবের মধ্যে সহজাত যে দরদ, পরহিতৈষণা, অদোষদর্শিতা, সহিষ্ণুতা ইত্যাদি বর্তমান, তার সাহায্যেই এই জটিল সমস্যার মোকাবিলা করা সম্ভব।

আরও কথা, ইদানীং কি উন্নত দেশ, কি উন্নয়শীল বা অনুন্নত দেশ— সর্বত্রই মানুষ সচেতন হয়ে উঠেছে পুরুষের নির্লজ্জ প্রাধান্য সম্বন্ধে। ১৯৭৭ থেকে প্রতি বছর ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারীদিবস উদযাপিত হচ্ছে। ঘোষিত উদ্দেশ্য— সকলের মধ্যে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠেনি নারীকে তার স্বাভাবিক বিকাশের সুযোগ দিতে হবে— এ-ভাবনা। নারী-আন্দোলনের ক্ষেত্রে অনেক সময়ই পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা হ্রাস চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর পাশাপাশি মাতৃভাব— যা অনেক সময়েই ভুল করে মনে করা হয় শুধুমাত্র নারীদের মধ্যেই সীমিত, তার শক্তি ও বিরাট সম্ভাবনা সত্ত্বেও প্রায় অনাদৃত হয়ে পড়ে রয়েছে। মাতৃভাবের প্রধান মূল্যগুলি আন্তরিকভাবে গ্রহণ করলে এবং বৃহত্তর সমাজে তা সঞ্চারিত করে দিতে পারলে, তাহলে নারী-সমস্যার সহজ ও সুষ্ঠু সমাধান সম্ভব। প্রশ্ন, মাতৃভাব কি শুধু মেয়েদের মধ্যেই প্রযোজ্য? এর উত্তর— মোটেও না। শ্রীশ্রীচণ্ডী বলছেন ঃ "যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা"। সেখানে বলা হয়নি যে, জগন্মাতা শুধু নারীদের মধ্যেই রয়েছেন। কেউ কেউ এই ভাবনার প্রতিবাদ করেছেন, নানা জনে নানানভাবে এর ব্যাখ্যা করেছেন। স্বামী সারদানন্দকে একদিন তাঁর এক শিষ্য প্রশ্ন করেন শ্রীশ্রীচণ্ডীর এই বাক্যটি সম্বন্ধে। মহারাজ তখন কাশীতে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বললেন ঃ "কেন, গীতাতে তো পরিষ্কার সুন্দরভাবে সপ্তম অধ্যায়ে শ্রীভগবান বলছেন—

'অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ।।"

সেখানে দেখা যাচ্ছে যে, সেই ঈশ্বরই একমাত্র পুরুষ আর বাকি সবকিছু প্রকৃতি। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে বলা যায়, মাতৃভাব পুরুষ-নারী সবার মধ্যেই বর্তমান। বলা বাহুল্য, এই মাতৃভাব একটা ভাব বা ধারণা। এই ভাবনা প্রত্যেকের মধ্যে নিহত রয়েছে, একে বিকশিত করতে হবে। এ-ভাব বিকশিত করতে পারলে আমাদের ব্যক্তিজীবন কুসুমিত হয়ে উঠবে। ব্যক্তিজীবনের কর্কশতা দূর হবে। ব্যক্তিজীবনে এখানে-সেখানে যেসমস্ত খোঁচ রয়েছে, সেসব চলে যাবে। অপরের সঙ্গে সম্পর্ক মধুর হয়ে উঠবে। স্বাভাবিক গতিতে বৃহত্তর সমস্যাগুলির সমাধান সহজে হয়ে যাবে। এই ভাব বা আদর্শ অনুসরণ করার জন্য প্রয়োজন এক বা একাধিক আকর্ষণীয় চরিত্র— সে চরিত্র হচ্ছেন রামকৃষ্ণ-সারদা জুটি। তাঁদের মধ্যে, বিশেষত শ্রীসারদাদেবীর মধ্যে, পরিপূর্ণভাবে বিকশিত মাতৃভাবের গ্রহণ ও প্রচারের মধ্যেই রয়েছে আমাদের সকল সমস্যার সমাধান।

সৌজন্যে ঃ উদ্বোধন(লেখক বর্তমানে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক)

১৩০০ বছরের প্রাচীন মন্দির উদ্ধার ভোপালে

নিজস্ব প্রতিনিধি।। ঐতিহ্য ও আভিজাত্যের ছোঁয়ায় মোড়া এক বৈচিত্র্যময় দেশ ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রতিটি কোণায় লুকিয়ে আছে বহু প্রাচীন তথ্য। লুকিয়ে আছে অসংখ্য অজানা সত্য। সম্প্রতি ভোপাল থেকে ৩৫ কিলোমিটার দূরে আশাপুরী গ্রামে এমনই এক প্রাচীন সত্যের মুখোমুখি হয়েছেন মধ্যপ্রদেশের আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার প্রত্নতাত্ত্বিকগণ। প্রায় ১৩০০ বছরের কয়েকটি প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ উদ্ধার করেছেন তারা।

মধ্যপ্রদেশের আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার কমিশনার অশোক দাস এই প্রসঙ্গে বলেন, "আমরা যে প্রাচীন মন্দিরগুলোর ধ্বংসাবশেষটিকে উদ্ধার করেছি সেগুলো। পার্মার রাজবংশের পূর্বে প্রতিহার রাজবংশের আমলে নির্মিত। আয়তনে এই মন্দিরগুলো যেমন প্রকাণ্ড ছিল, তেমন দেখতেও ছিল অত্যন্ত সুন্দর। প্রায় ২১টি মন্দিরই নির্মাণ করা হয় প্রতিহার শাসকদের সময়। এর মধ্যে সব থেকে বড় মন্দিরটি নির্মিত হয় পার্মার শাসকদের শাসনকালীন সময়ে।"

স্থানীয় সূত্র অনুযায়ী, শুধু মন্দির নয়, প্রত্নতাত্ত্বিক বিশেষজ্ঞরা প্রায় ৪০০ হিন্দু দেবদেবীর মূর্তির ধ্বংসাবশেষও উদ্ধার করেছেন যেগুলো প্রতিহার ও পার্মার শাসকদের সময়ে নির্মাণ করা হয়।

মধ্যপ্রদেশের সংস্কৃতিমন্ত্রী লক্ষ্মীকান্ত শর্মা জানান "ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ বস্তু উদ্ধার ও রক্ষা করার কাজ আর্কিওলজিক্যাল দপ্তরের। সেইজন্য রাজ্য সরকারও ভারতবর্ষের এই প্রাচীন ও দুর্লভ বস্তুকে রক্ষা করার দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন।" প্রত্নতাত্ত্বিক মহলের মতে, মন্দিরগুলো নির্মাণ করা হয় পার্মার ও প্রতিহার শাসকদের সময়ে। তবে মন্দিরগুলোর ক্ষতি হয় মুঘল সামাজ্যের শাসনকালে সময়ে। প্রত্নতাত্ত্বিকরা এই আবিষ্কৃত প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানটিকে 'ভূতনাথ মন্দির সমষ্টি'র নামে নামাঙ্কিত করেছেন।

কর্মযোগ

রাজ্য সমবায়ে ২৪টি চাকরী

নীল উপাধ্যায়

ওয়েস্টবেঙ্গল স্টেট্ কোঅপারেটিভ মার্কেটিং ফেডারেশন (বেনফেড) কোঅপারেটিভ ইন্‌স্টিটিউশনের জন্য অ্যাকাউন্ট্যান্ট্ ও ম্যানেজার পদে লোক নিচ্ছে। মোট শূন্যপদ ২৪। বিভিন্ন পদ ও যোগ্যতা হলো—

(১) ম্যানেজার (অ্যাকাউন্টস ও অডিট)— শূন্যপদ ১। যোগ্যতা—৫৫ শতাংশ নম্বর পেয়ে এম কম পাশ (সিএ/এস সি এ/এম বি এ ফিনান্স থাকলে ভাল হয়) এবং সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ৫ বছরের অভিজ্ঞতা। বেতন—শুরুতে ১৮,৫৫২ টাকা, সঙ্গে ৩টি অতিরিক্ত ইনক্রিমেন্ট।

(২) (ডেপুটি ম্যানেজার একাউন্টস ও অডিট)—শূন্যপদ— ২ (১ জেনারেল, ১ তপশিলি জাতি)। যোগ্যতা— ৫৫ শতাংশ নম্বর পেয়ে বিকম অনার্স (কম্পিউটার ডিপ্লোমা ইন ফিনানসিয়াল অ্যাকাউন্টিং থাকলে অগ্রাধিকার) এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা। বেতন ঃ শুরুতে ১৭,১৪৮ টাকা।

(৩) অ্যাসিট্যান্ট ম্যানেজার (অ্যাকাউন্টস)। শূন্যপদ— ৩ (২ জেনারেল, ১ তপশিলি জাতি)। যোগ্যতা ঃ ৫০ শতাংশ নম্বর পেয়ে বিকম অনার্স বা উচ্চশিক্ষা (ফিনান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং-এ কম্পিউটার ডিপ্লোমা বাঞ্ছনীয়)। বেতন ঃ ১৫,৯৭৮ টাকা।

(৪) অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার— শূন্যপদ ঃ ১০ (জেনারেল ৬, তপশিলি ২, তপশিলি উপজাতি ১, ওবিসি ১)। যোগ্যতা ঃ ৫০ শতাংশ নম্বর পেয়ে গ্র্যাজুয়েট বা উচ্চতর যোগ্যতা (এগ্রিকালচার গ্র্যাজুয়েট), সেইসঙ্গে ৬ মাসের বেশি কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনে ট্রেনিং বা ডিপ্লোমা থাকলে অগ্রাধিকার। বেতন ঃ শুরুতে ১৫,৯৭৮ টাকা।

(৫) ব্রাঞ্চ অ্যাকাউন্ট্যান্ট। শূন্যপদ ঃ ৮ (জেনারেল ৫, তপশিলি ২, তপশিলি উপজাতি ১)। যোগ্যতা ঃ ৫০ শতাংশ নম্বর পেয়ে বি কম বা উচ্চতর যোগ্যতা। কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনে ৬ মাসের বেশি ট্রেনিং বা ডিপ্লোমা থাকা বাঞ্ছনীয়। বয়স ঃ ১নং পদের ক্ষেত্রে ৩৫ পর্যন্ত। ২-৪নং পদের ক্ষেত্রে ৩০ পর্যন্ত এবং ৫নং পদের

(এরপর ১৪ পাতায়)

।। চিত্রকথা ।। পরশুরাম ।। ১৭

বিচিত্র খবর বিচিত্র গল্প

।। নির্মল কর।।

ঠোঙায় জীবনানন্দ-সুনীল-জয়

ঢাউস উপন্যাস, দীর্ঘ কবিতা, জটিল নিবন্ধ পড়ার সময় কমে যাচ্ছে বাঙালি পাঠকের। এই সত্য মাথায় রেখেই শান্তিনিকেতনের ক'জন বর্তমান ও প্রাক্তনী প্রকাশ করেছেন ছোট্ট এক কবিতার দেয়াল-পত্রিকা 'দেওয়াল'। কবিতা দু'লাইনের। পত্রিকার সঙ্গে থাকছে একটি ঠোঙা। তাতেও কবিতা। চাল ডাল চিনির মতো কবিতাও একদিন ঠোঙায় বিকোবে, এমন ভাবনা থেকেই এই উদ্যোগ। পত্রিকার সর্বঘটে কাঁঠালি এক সদস্য জানালেন, এর সদস্য সংখ্যা দেড় শতাধিক। প্রত্যেকের দায়িত্ব সদস্য সংগ্রহ। ঠোঙায় জীবনানন্দ শক্তি সুনীল জয়-এর মতো বিশিষ্ট কবিরাও থাকছেন।

প্রথম চাবুক

ইয়ংবেঙ্গলের দিশারী হেনরি ডিরোজিওই ভারতের প্রথম সাংবাদিক, যিনি সৎ ও সাহসী সাংবাদিকতার পুরস্কার স্বরূপ বেত্রাহত হয়েছিলেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ম্যাক নর্টন সাহেব ডিরোজিওর বাড়িতে গিয়ে তাঁকে চাবুক মারেন। 'ইস্ট ইন্ডিয়া' পত্রিকায় এদেশের মানুষের স্বার্থে তাঁর একটি জোরালো রচনার জন্যই ডিরোজিওকে ওই শাস্তি ভোগ করতে হয়েছিল।

সমুদ্র যেখানে গভীরতম

পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের মারিয়ানা ট্রেঞ্চ অঞ্চলে গভীরতা এতটাই যে, একটি আস্ত হিমালয় পর্বতকে সেখানে বসিয়ে দিলেও হিমালয়ের সর্বোচ্চ শিখরের উপরে জলের গভীরতা থাকবে এক মাইল। সমুদ্রের এই অংশটিকে বলে 'চ্যালেঞ্জার ডিপ'। ৩৫ হাজার ফুট নীচে গভীরতম অন্ধকার সমুদ্রতলে পৃথিবী সম্পর্কে অনেক মৌলিক প্রশ্নের সূত্র লুকিয়ে আছে, যার সন্ধানে ডুব দিয়েছে বিশেষভাবে নির্মিত যান 'হাইব্রিড রিমোটলি অপারেটেড ভেহিক্‌ল'।

সুরের সাধনা শক্ত বটে, একটা বেহালা তৈরি করতে ৭০টি আলাদা কাঠের টুকরো লাগে।

হাতি দিনে ২৩ ঘণ্টা শুধু খাওয়ার জন্যই ব্যয় করে।

বৃটিশ ও হল্যান্ডের মধ্যে বোয়ার যুদ্ধে অসংখ্য সেনার মৃত্যু হয়েছিল— যুদ্ধে আহত হয়ে নয়, টাইফয়েড রোগে।

জয়েন্ট স্কুইড বা দৈত্যাকার অক্টোপাসের এক একটি চোখের মাপ প্রায় ফুটবলের সমান।

র/ঙ্গ/কৌ/তু/ক

মিউজিয়াম গাইড ঃ যে-মূর্তিটা তুমি ভাঙলে জানো সেটা পাঁচশো বছরের পুরনো!

পিকু ঃ যাক্ বাবা, নতুন জিনিস ভাঙলে চিন্তা ছিল।

* * *

প্রশ্ন ঃ সবচেয়ে উন্নত জেলার নাম কী?

উত্তর ঃ কেন, ভুভুজেলা!

* * *

কবি (অনুষ্ঠানে) ঃ আমি যে-কবিতাটা পড়ছি তার নাম 'আগুন জল ধোঁয়া'।

এক শ্রোতা ঃ এক কথায় বললেই তো হয় হুঁকো!

* * *

ছেলে ঃ মা, খেয়ে পেটটা আইঢাই করছে। একটু মৌরি দাও তো!

মা ঃ টিভি দেখার কী মহিমা, জোয়ানের কথাটা মনে পড়ল না, চাইছিস মৌরি!

* * *

গৃহকর্তা ঃ ওরে রামু, গাছগুলোয় জল দে!

রামু ঃ বাবু এখন তো বৃষ্টি হচ্ছে।

গৃহকর্তা ঃ বৃষ্টি হচ্ছে তো কী হয়েছে, ছাতা নিয়ে যা।

—নীলাদ্রি

মগজচর্চা

১। প্রথম আন্তর্জাতিক ফুটবলার হিসেবে 'নোবেল পিস সামিট অ্যাওয়ার্ড' পান কে?

২। অরণ্যদেবের সন্তানদের নাম কী?

৩। 'লঙ ওয়াক টু ফ্রিডম'— এই আত্মজীবনীটা কার?

৪। ভারতীয় বংশোদ্ভূত কমলাপ্রসাদ বিশেসার কোন্ দেশের প্রধানমন্ত্রীর পদে আসীন হন?

৫। বাতাসের গতিবেগ মাপতে যে-যন্ত্রটি ব্যবহৃত হয় তার নাম কী?

—নীলাদ্রি

উত্তর ঃ

১। ইতালির রবার্তো বাজ্জিও

২। কিট ও হেলোয়েজ

৩। নেলসন ম্যান্ডেলার

৪। ত্রিনিদাদ (২০১০)

৫। অ্যানিমোমিটার (Anemometer)

সংস্কার ভারতীর দক্ষিণবঙ্গ শিল্পী সম্মেলন

সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গের বিংশতিতম প্রাদেশিক (দক্ষিণবঙ্গ) শিল্পী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো গত ৩০-৩১ অক্টোবর মেদিনীপুর নগরে। দু'দিন ব্যাপী সম্মেলনে সারা দক্ষিণবঙ্গ থেকে প্রায় ৩০০ প্রতিনিধি অংশ গ্রহণ করেন। সমস্ত প্রতিনিধিদের স্বাগত জানিয়ে সম্মেলনের অনুষ্ঠানিক সূচনা করেন প্রদেশ সম্পাদিকা নীলাঞ্জনা রায়। এরপর ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের পূজ্যপাদ স্বামী মিলনানন্দ মহারাজ নটরাজ মূর্তির সামনে প্রদীপ প্রজ্বলন করে দু'দিন ব্যাপী সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। মঞ্চে ছিলেন দক্ষিণবঙ্গ প্রদেশ সভাপতি ও বিশিষ্ট নাট্যকার ও অভিনেতা তপন গাঙ্গুলী, বিশিষ্ট অতিথি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগীয় প্রধান ডঃ অচিন্ত্য বিশ্বাস, ডঃ অচিন্ত্য এ পি ঘোষ, ডঃ প্রামাণিক, প্রদেশ কার্যকরী উপদেষ্টা পূর্ণচন্দ্র পুইতুন্ডি, অখিল ভারতীয় সহ নাট্য প্রমুখ বিকাশ ভট্টাচার্য, পূর্বাঞ্চল সাধারণ সম্পাদক সুভাষ ভট্টাচার্য এবং সম্মেলন সভাপতি সুকুমার মাইতি। ডঃ বিশ্বাস বলেন, সারাদেশকে বাজার অর্থনীতি গ্রাস করছে, বর্তমানের সাহিত্যচর্চা যখন ছোট ছোট পরিবার ব্যবস্থার ধারণা এনে সমাজকে ভেঙ্গে টুকরো করতে চাইছে, সেই সময় তার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য চাই আমাদের সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতি এমন একটা সংস্কৃতি যা বিলুপ্ত করা যায় না। রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের সেই উপনিষদ ভিত্তিক সংস্কৃতিকেই তুলে ধরতে চেয়েছেন।

প্রদেশ সভাপতি তপন গাঙ্গুলী বলেন, এখন অন্ধকারের যুগ চলছে, আর সেই অন্ধকার থেকে আলোর সন্ধান দিতে সংস্কার ভারতী কাজ করে চলেছে। বিভিন্ন অধিবেশনের পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন প্রদেশ সংগঠন সম্পাদক ভরত কুণ্ডু।

বিকালবেলা সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রা করে সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী সকল শিল্পীরা পৌঁছান মেদিনীপুর বিদ্যাসাগর স্মৃতি মন্দিরে। সান্ধ্য অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ সভাপতি তপন গাঙ্গুলী, বিশিষ্ট অভিনেতা সুব্রত গুহরায়, বিশিষ্ট লোকসঙ্গীত শিল্পী স্বপ্না চক্রবর্তী, বিশিষ্ট সুরকার প্রশান্ত ভট্টাচার্য প্রমুখ।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে উত্তরপাড়া শাখার ছিল নৃত্যানুষ্ঠান, সমবেত শাস্ত্রীয় সঙ্গীত, ব্যান্ডেল শাখার জলতরঙ্গ-তবলা-মাউথঅরগ্যান ও গানের মেল-বন্ধন, বাগনান, বাউড়িয়া শাখার সঙ্গীতালেক্ষ্য, দক্ষিণ হাওড়া শাখার ঝুমুরগানের সঙ্গে শিশুশিল্পীদের লোকনৃত্য এবং ভক্তিরসে মাতিয়ে নবদ্বীপ শাখার কীর্তনের অনুষ্ঠান।

বিকালের সান্ধ্য অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন সংস্কার ভারতীর পূর্বক্ষেত্র সভাপতি ভিক্টর ব্যানার্জী, নৃত্যশিল্পী কহিনূর সেন বরাট, সঙ্গীত শিল্পী মানস চক্রবর্তী প্রমুখ।

এদিনের দ্বিতীয়পর্বের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে কসবা, বেহালা ও তমলুক শাখার সঙ্গীতানুষ্ঠান, কাঁথিশাখার রবীন্দ্রনাথের হাসির গান, ধ্রুবজিৎ ভট্টাচার্যের সঙ্গীত, উত্তর কলকাতা শাখার নৃত্যানুষ্ঠান, আসানসোল জেলার 'তবলা লহরা', আসানসোল শাখার ঝুমুর গান, মেদিনীপুর শাখার নৃত্যানুষ্ঠান 'শিববন্দনা' ছিল অনুষ্ঠানের অন্যতম সফল পরিবেশনা। রবীন্দ্রনাথের সার্ধশত জন্মবর্ষ উপলক্ষে সিউড়ি শাখার নিবেদন ছিল নৃত্যানুষ্ঠান 'নব নব রূপে এসো প্রাণে'। পরিশেষে আদ্রা শাখার ভজন পরিবেশনার মাধ্যমে সম্মেলনের সমাপ্তি ঘটে।

ডঃ প্রণব রায়ের সম্বর্ধনা

সম্প্রতি হাওড়ার সংস্কৃত সাহিত্য সমাজ অধ্যাপক ডঃ প্রণব রায়ের সংস্কৃত ও প্রাচীন মন্দির স্থাপত্য বিষয়ে গবেষণা ও সাহিত্যচর্চার জন্য তাঁকে সম্বর্ধিত করেন। গত ২৭ নভেম্বর এই সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃত সাহিত্য সমাজের সম্পাদক ডঃ দেবব্রত মুখোপাধ্যায়। সভাপতি ছিলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক ডঃ মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। এবছর বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাম্মানিক ডি. লিট. প্রাপ্ত এবং গত বৎসর (২০০৯) রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের দৃশ্যকলায় গবেষণার জন্য 'রাজ্য আকাদেমি সম্মান' প্রাপ্ত অধ্যাপক রায়কে সংস্কৃত শ্লোকে রচিত একটি প্রশস্তিপত্র, ধুতি, উত্তরীয় ও পুষ্পমাল্য দিয়ে সম্বর্ধনা জানানো হয়। ডঃ রায় সংস্কৃত ভাষায় তাঁর বক্তব্য রাখেন ও পরে প্রাচীন মন্দির স্থাপত্যভাস্কর্য নিয়ে ভাষণ দেন।

উল্লেখ্য, চণ্ডীতলা-বরিজহাটীর 'তানসেন মিউজিক রিসার্চ অ্যাকাডেমি' গত ১৪ নভেম্বর 'গরলগাছা সাধারণ পাঠাগারে' পশ্চিম বাংলার ১৫ জন শিল্পী ও গুণীব্যাক্তিদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁদের অবদানের জন্য সম্বর্ধনা জানান। ড. প্রণব রায়কেও সেদিন তাঁর মন্দির স্থাপত্য, পুরাতত্ত্ব ও আঞ্চলিক ইতিহাসে অবদানের জন্য সম্বর্ধিত করা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন প্রাক্তন বিচারপতি ভগবতীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। অধ্যাপক রায় ছাড়াও সংবর্ধিতদের মধ্যে ছিলেন বাক্সা (জনাই) হাইস্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক ডঃ ভুবনেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, সঙ্গীতশিল্পী মায়া মুখোপাধ্যায়, দুঃখহরণ ঠাকুর চক্রবর্তী, ডঃ শচীন্দ্রনাথ বড়পণ্ডা প্রমুখ।

সমাবেশ সমাচার

বঙ্গীয় শিক্ষক সঙ্ঘের সম্মেলন

বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘের (মাধ্যমিক) নদীয়া জেলা সম্মেলন গত ৫ ডিসেম্বর কৃষ্ণনগর সরস্বতী শিশু মন্দিরে হয়ে গেল। স্বাগত ভাষণ দেন জেলা সভাপতি বিদ্যুৎ মৌলিক। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক অরূপ সেনগুপ্ত ও রাজ্য সভাপতি ডঃ অজিত ব্যানার্জী বর্তমান পরিস্থিতিতে তাদের সংগঠনই ভারতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে রক্ষা করে দেশাত্মবোধ, চরিত্র ও মূল্যবোধের শিক্ষার সঠিক দিশা দিতে পারে বলে দৃঢ়প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। জেলার শিক্ষক প্রতিনিধিরা সংস্কৃত শিক্ষাকে মাধ্যমিক স্তরে আবশ্যিক করা, আধ্যাত্মিক শিক্ষা ও নৈতিক শিক্ষা চালু করার দাবী জানান। কেন্দ্রীয় সরকারের দশম শ্রেণী পর্যন্ত পাশ-ফেল প্রথা রদ করার প্রস্তাব ও রাজ্য সরকারের জীবন-শৈলীর নামে যৌন শিক্ষা চালু করার তীব্র সমালোচনা করা হয়। সম্মেলনে পার্শ্বশিক্ষক, শিক্ষাকর্মী ও অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের বিভিন্ন বিষয় নিয়েও আলোচনা হয়। শিক্ষক সংগঠনের প্রাদেশিক সংগঠন সম্পাদক নারায়ণচন্দ্র পাল মহাশয় সমারোপ ভাষণে সকল শিক্ষক বন্ধুগণকে সংগঠনের কাজে সবরকম সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

এই সভায় সুবলচন্দ্র সরকার— সভাপতি, গৌতম পাল— সম্পাদক, জগন্নাথ সরকার —জেলা সংগঠন সম্পাদক-সহ মোট ১৫ জন শিক্ষককে নিয়ে একটি জেলা সমিতি গঠিত হয়।

ক্যান্সার সচেতনতা শিবির

দ্য ইন্টারন্যাশনাল মিশন ফর সোস্যাল ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড চ্যারিটির উদ্যোগে গত ৬-৮ নভেম্বর ঝাড়খণ্ড ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় ক্যান্সার সচেতনতা ও তৎ-সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে শিবিরের আয়োজন করা হয়। ৬ নভেম্বর ঝাড়খণ্ডের অন্তর্গত রাঁচী জেলার অধীন 'বাড়িয়াটু' এবং কোকার গ্রামে ক্যান্সার সচেতনতা, প্রতিরোধ ইত্যাদি বিষয়ে আয়োজিত শিবিরে ৩৫০ জন যোগদান করেন। পরদিন অর্থাৎ ৭ নভেম্বর এরাজ্যের মুর্শিদাবাদ জেলার গঙ্গাধারী এবং সর্বাঙ্গপুর গ্রামে ক্যান্সার সেমিনার, সিগারেট, বিড়ি ধূমপান, মদ্যপান ও ধূমহীন জর্দা, খৈনী, নস্যি প্রতিরোধ ও সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরে অংশগ্রহণ করেন ৩২৫ জন। ৮ নভেম্বর উত্তর চবিবশ পরগণাস্থিত 'সিকরা কুলীন' এবং 'রাজেন্দ্রপুর' গ্রামে অনুরূপ ক্যান্সারশিবির আয়োজিত হয়। এতে যোগদান করেন ৪১০ জন। শিবিরগুলিতে উপস্থিত ছিলেন ইন্টারন্যাশানাল মিশনের মহাসচিব দেবাশীষ ঘোষ, স্বামী সেবানন্দ গিরি, অরুণ ব্যানার্জী, কার্তিক চ্যাটার্জী, মলি ঘোষ (বাগচী), সৌভিক বাগচী, কল্যাণ পাল প্রমুখ। শিবিরে অংশগ্রহণকারী সকলকে বিনামূল্যে চিকিৎসা, রক্তপরীক্ষা ও ওষুধ বিতরণ করা হয়।

চক্ষু-পরীক্ষা শিবির

গত ২৭ নভেম্বর কেশবচন্দ্র চক্রবর্তী স্মৃতি রক্ষা সমিতি আয়োজিত এক চক্ষু-পরীক্ষা ও ছানি অপারেশন শিবির অনুষ্ঠিত হয়। 'এম পি বিড়লা আই ক্লিনিক'— এই শিবিরের বন্দোবস্ত করেন। উক্ত শিবিরে চক্ষু-পরীক্ষা করান ৯৫ জন এবং ছানি অপারেশন হয় ৩৫ জনের।

ভারতমাতা পুজো

প্রতি বছরের মতো এবারও হাওড়া জেলার জগৎবল্লভপুরের মুন্সীরহাট থানার অন্তর্গত নাইকুলি গ্রামে মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হলো ভারতমাতার পুজো। প্রসঙ্গত গ্রামটিতে গত ৫ বছর যাবৎ দুর্গাপ্রতিমার পরিবর্তে ভারতমাতার প্রতিমাকেই পূজা করা হয়। এই উপলক্ষে পুজোর ক'টা দিন নানান সাংস্কৃতিক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান থেকে শুরু করে বিভিন্ন সেবামূলক কাজ যেমন রক্তদান শিবির ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। এবছর পুজো উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন সাঁকরাইল পরমান্দ আশ্রমের স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ মহারাজ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আর এস এসের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত ঘোষ (বাদ্য) প্রমুখ স্বপন ঘোষ, প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক সনৎ ঘোষ, পরেশ দে ও কাজল চীনে প্রমুখ। উল্লেখ্য, ভারতমাতার পুজোর আয়োজনের বেশিরভাগ দায়িত্ব সামলেছেন পাড়ার মহিলাদের নিয়ে গড়ে ওঠা মাতঙ্গিনী বাহিনীর সদস্যারা।

জম্মু-কাশ্মীরের ভারতভুক্তি দিবস

গত ২৬ অক্টোবর জম্মু-কাশ্মীরের ভারতভুক্তি উদ্‌যাপন দিবসে হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়াতে জম্মু-কাশ্মীর ভারতভুক্তি উদ্‌যাপন সমিতির পক্ষ থেকে একটি পথসভার আয়োজন করা হয়। প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আর এস এসের হাওড়া জেলা প্রচার প্রমুখ শুভেন্দু সরকার, সভাপতি ছিলেন নয়ন সিংহ রায়। সমিতির পক্ষ থেকে সভা আয়োজনের তদারকিতে ছিলেন মলয় পাল।

বিজয়া-দীপাবলী উৎসব

গত ১৩ নভেম্বর সন্ধ্যায় সংস্কার-ভারতীর উত্তর-পাড়া শাখা স্বামী নিঃসম্বলানন্দ কালিকা মহাবিদ্যালয়ের আলোচনা কক্ষে পালিত হলো বিজয়া-দীপাবলী উৎসব। শাখা সম্পাদিকা উমা মুখোপাধ্যায়ের সংস্কার উদ্বোধনী সঙ্গীত দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এরপর দু'টি রবীন্দ্র-সঙ্গীত পরিবেশন করেন সুধীর মল্লিক। তাঁকে তবলা সঙ্গত করেন বনমালী ভট্টাচার্য। তিনি ছাড়াও অনুষ্ঠানে অন্য যাঁরা সঙ্গীত পরিবেশন করেছিলেন তাঁরা হলেন মৌসুমী তেওয়ারী (ভক্তিগীতি), পাপিয়া ব্যানার্জী (ভক্তি-গীতি), রীতা দাস ও চিত্রা মুখার্জী (রবীন্দ্র ও ভক্তিগীতি)। নৃত্যে ছিলেন— কুমারী প্রজ্ঞা দাস, পাপিয়া সাহা, প্রিয়াঙ্কা সাহা। প্রীতি চট্টোপাধ্যায় ও সরোজ মান্নার (রূপকল্প) একটি কৌতুক নক্সা (শ্রুতিনাটক) দর্শকদের কাছে অত্যন্ত উপভোগ্য হয়ে উঠেছিল। প্রদেশ থেকে পর্যবেক্ষকরূপে ছিলেন দেবাশীষ লাহিড়ী। সংস্কার ভারতীয় শাখা সভাপতি অধ্যাপক বিজয় চক্রবর্তীর ধন্যবাদজ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে।

সি পি ডি আর-এর আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সভা

তপন চট্টোপাধ্যায়

রমা দাস

নিজস্ব প্রতিনিধি।। মানুষের সবচাইতে বড় বন্ধু হলো সুস্থ চেতনা। এই চেতনার জাগরণকেই মানবতার কাজ বলে উল্লেখ করলেন দক্ষিণ কলকাতার একটি উচ্চমাধ্যমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক ডঃ ভাস্করজ্যোতি বসু। গত ১০ ডিসেম্বর কলকাতার শিয়ালদহ নেতাজী সুভাষ সভাঘরে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা সি পি ডি আর-এর ৬৩তম মানবাধিকার রক্ষা দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে এসে তিনি এই মন্তব্য করেন।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের প্রাক্তন অধিকর্তা তপন চট্টোপাধ্যায়, বেঙ্গল জার্নালিস্ট এসোসিয়েশনের কর্ণধার বিজয় রায় পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশনের ভাইস-চেয়ারম্যান রমা দাসসহ বহু বিশিষ্ট সমাজসেবী এবং সি পি ডি আর-এর সম্পাদক শ্যামল শিকদার প্রমুখ। অনুষ্ঠানে মুখ্য আকর্ষণ ছিল রবীন্দ্রনৃত্য এবং বন্দেমাতরম সঙ্গীতের উপর নৃত্যানুষ্ঠান। সারা বাংলায় সমস্ত জেলা থেকে পাঁচশোরও বেশী প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগদান করেন।

আন্তর্জাতিক সম্মানে ভূষিত

‘বিপন্ন আমার স্বদেশ’

মিতদ্রু দত্ত॥ অন্ধকার মঞ্চে ফুটে উঠল আলোর বৃত্ত। ভারতের মানচিত্রের ছায়াছবি স্পষ্ট হয়ে উঠল। বেজে উঠল সহস্র শঙ্খধ্বনি। মঞ্চ জুড়ে প্রস্ফুটিত হলো পদ্ম। না, কোনও কল্পলোক নয়, নাট্য সংসদ (ঢাকা) সম্প্রতি রবীন্দ্রসদনে আয়োজন করেছিল এক অনন্য সাধারণ নৃত্যনাট্যের। প্রযোজনাটির নাম ‘বিপন্ন আমার স্বদেশ।’ নৃত্যনাট্যের মূল বিষয়বস্তু ধর্মীয় (ইসলামী-তালিবানি) মৌলবাদের ভয়ঙ্কর স্বরূপ ও তার পরিণতি। দেখানো হয়েছে ভারতের এবং বাংলাদেশের নানা প্রত্যন্ত জনবসতি ও গ্রামে কিভাবে মুসলীম মৌলবাদীরা নিষ্পাপ মানুষদের ওপর সন্ত্রাস-শোষণের দ্বারা ধর্মান্তরকরণ করছে। কেড়ে নেওয়া হচ্ছে বাক্-স্বাধীনতা। একঘরে করে রেখে বলা হচ্ছে ‘অচ্ছুৎ’। কারণ, তাদের অপরাধ একটাই, তারা ‘হিন্দু’। তারা অনেকেই আজ প্রাণের দায়ে বাধ্য হয়ে ধর্মান্তরিত হচ্ছেন। কেউ কেউ আবার দৈনন্দিন জীবনযুদ্ধের পাশাপাশি নিজেদের অস্তিত্ব, পরম্পরা ও আদর্শকে ধ্বংস হতে দিতে নারাজ।

তারা যেমন দারিদ্র্যের সাথে, অশিক্ষার অন্ধকারের সাথে লড়াই করে চলেছেন প্রতিনিয়ত, তেমনই নিজেদের ধর্ম ও চেতনা রক্ষার লড়াইয়েও আজ তারাই অগ্রণী। দু-বেলা পেট ভরে খেতে না পেলেও তারাই আজ দুঃসাহসী। বড় বেশি প্রতিবাদী। এত সাহস তারা পেল কোত্থেকে? এসেছে বাংলাদেশেরও নানা গ্রামের সংখ্যালঘু নির্যাতনের মর্মস্পর্শী ছবি। উগ্র-ধর্মান্ধ মৌলবাদীরা হিংস্র তাণ্ডব চালাচ্ছে ঘরে ঘরে। অবাধে চলছে লুঠপাট, নারী ধর্ষণ, শিশুরাও সে অত্যাচার থেকে রেহাই পাচ্ছে না। রেহাই নেই অবোধ, অসহায় খুঁট-এ বাঁধা গরুগুলিও। মৃত্যুর পরোয়ানা যে তাদেরও ডাকছে...। বীভৎস!! এক দৃশ্য। গাছের সাথে শিশুদের বেঁধে তাদের বাবা-মা-র চোখের সামনে হত্যার ফরমান জারি করছে। ভাবলে লজ্জা হয়! ঘৃণা জাগে! স্বাধীনতা নিয়ে প্রশ্ন জাগে। কান্নাসিক্ত হয় দু-চোখ। হায় মানবতা! হায় গণতন্ত্র! তবুও মৃত্যুকে এঁরা জয় করতে পেরেছেন। নিজেদের ধর্মকে এঁরা জয় করেছেন নিজেদের জীবন দিয়ে। এঁরাই তো প্রকৃত ধার্মিক। নৃত্যনাট্যের শেষে দেখানো হচ্ছে শত-সহস্র অপমান, বঞ্চ না আর অত্যাচারের কালো রাত মুছে গিয়ে নতুন দিনের নবসূর্যোদয়ের শুভ সূচনা হচ্ছে, আবার শঙ্খধ্বনি...আবার “ওঁ জবাকুসুমসংকাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং” ধ্বনিত হচ্ছে প্রাণে-মনে। গ্রামের গৃহবধূরা তুলসীতলায় প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করছেন। মুক্তির আনন্দ...যুদ্ধ জয়ের উন্মাদনা। শরীরে-মনে। তবু এই তাণ্ডব কেড়ে নিয়েছে ৩২টি তাজা প্রাণ। নির্দেশনায় সুরজিৎ বসু চমৎকার। সঙ্গীত কল্যাণ রায়ের।

মুখ্য চরিত্রে সুমিত্রা (দেবলীনা বসু), উগ্র মৌলবাদীর চরিত্রে এ খান-এর (শিবনাথ বসু) অভিনয় অ-সাধারণ। সম্প্রতি ফ্রান্সের আন্তর্জাতিক মানবিক নাট্যমেলায় বিশেষ জুরি অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত হয়েছে। ইন্টারন্যাশনাল পিস অ্যাওয়ার্ড, হিউম্যানিটি অ্যান্ড ডেমোক্রেটিক প্রোডাকশন অ্যাওয়ার্ড সহ বহু বিশিষ্ট সম্মানে ভূষিত এই প্রযোজনাটি প্রথম চাক্ষুস করল কলকাতা। অসাধারণ সাহসী ও শক্তিশালী এ নির্মাণ বহুদিন মনে রাখবে মহানগর।

রঙ্গম

হাজার পর্বের মেগা ধারাবাহিক

জগজ্জননী মা সারদা

।। মিতদ্রু দত্ত।।

মা। তিনি সবার মা। তিনি সৎ-এর মা, অসৎ-এরও মা। তিনি জগৎ জননী মা সারদা। তিনি সাধারণ। অতি সাধারণ। তাই তিনি অনন্যা, অসাধারণ, অসামান্যা। এ পৃথিবীর সকল প্রাণের মা তিনি। তিনি হিন্দুর মা, মুসলমানেরও মা। তিনি পরম মমতাময়ী, আশ্রয়দাত্রী, কোমল-করুণাময়ী একমূর্তি। এবার তাঁকে নিয়ে এক মেগা ধারাবাহিক নির্মিত হতে চলেছে কলকাতা দূরদর্শনে। হাজার পর্বের এই মেগা ধারাবাহিকের নাম ‘জগৎজননী মা সারদা’। ট্রন মিডিয়া প্রযোজিত এই মেগার ধারাবাহিকটি পরিচালনার দায়িত্বে আছেন রামানন্দ মুখোপাধ্যায়। এর আগে তিনি ‘আন্দুল কালীকীর্তন’ শীর্ষক তথ্যচিত্র নির্মাণের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

পরিচালকের কথায়, সারদা মাকে তাঁর জগৎজননী বলেই মনে হয়। ভূ-ভারতে এমন সুমহান দেবীর তুলনা পাওয়া কঠিন। তিনি কখনও রণচণ্ডী, কখনও দশভূজা, কখনও আবার তিনিই মহাকালী, কখনও আবার মমতাময়ী মা। বাংলার শাশ্বত সংস্কৃতি, পরম্পরা এবং ঐতিহ্যের পাশাপাশি ভাগবত, গীতা, বেদ, পুরাণের নানা চরিত্রও রূপ পেয়েছে প্রাথমিক পর্বগুলিতে। কলিতীর্থ কামারপুকুর, শ্যামপুকুর উদ্যানবাটীর ওপরও প্রায় দশটি পর্ব থাকছে। মায়ের বিবাহিত জীবন, তাঁর একাকীত্ব, আনন্দমুহূর্ত, গঙ্গাস্নান, পূজার্চনা ইত্যাদি নিয়েও থাকছে আলাদা ১১টি পর্ব। রামকৃষ্ণ সারদা সংঘের বিভিন্ন নারীকল্যাণ প্রকল্পও দেখা যাবে এই মেগায়। ধারাবাহিক শুরুর আগে প্রতিদিন পর্দায় ভেসে উঠবে মায়ের একটি বাণী। ‘যদি শান্তি চাও জীবনে তাহলে অপরের দোষ দেখো না’, কখনওবা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অমর বাণী ‘তোমাদের চৈতন্য হোক’। কখনও আবার স্বামীজীর ‘ওঠো জাগো, থেমো না ততক্ষণ যতক্ষণ না লক্ষ্যপূরণ হয়’-র মতো বাণী। মা-এর চরিত্রে রূপদান করেছেন অপর্ণা রায়। শ্রীরামকৃষ্ণ হয়েছেন সুধাংশু দে, বিবেকানন্দ —রতন দেব।

অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী, কনিনীকা বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপ্লব দেব, কমলিকা চৌধুরী, ইন্দ্রজিৎ দেব প্রমুখ। সঙ্গীত পরিচালনায় আছেন দেবশঙ্কর রায়চৌধুরী। নেপথ্য কণ্ঠে আছেন হৈমন্তী শুক্লা, ইন্দ্রানী সেন, শুভমিতা, স্বাগতালক্ষ্মী দাসগুপ্ত (পাঠ), প্রহ্লাদ ব্রহ্মচারী প্রমুখ। যে সন্তান ‘মা’ বলে তাঁকে সম্বোধন করেছেন তাঁকেই মা সন্তানস্নেহে বুকের কাছে টেনে নিয়েছেন। সব সমস্যা থেকে মুক্তির একমাত্র পথ যে তিনিই। যখন একলা, যখন যন্ত্রণা কাতর তখন তাদের কি করা উচিত তাও দেখা যাবে শেষ দৃশ্যে।

সমবায়ে চাকরি

(১২ পাতার পর)

ক্ষেত্রে ৩২ বছর পর্যন্ত। সংরক্ষিতরা যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন।

প্রার্থী বাছাই হবে কো-অপারেটিভ সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে। লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউ হবে। পরীক্ষার ফি—১৬০ (তপশিলিদের ৪০ পাঠাতে হবে আইপি ও মাধ্যমে কো-অপারেটিভ সার্ভিস কমিশনের অনুকূলে।)

একটি পদের জন্য একজন আবেদন করবেন। দরখাস্ত পাঠাতে হবে সাধারণ কাগজে টাইপ করে। পদের নাম, বিজ্ঞপ্তির নম্বর ১১/২০১০ উল্লেখ করতে হবে।

সম্প্রতি তোলা পাসপোর্ট ফটো এবং যাবতীয় যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার প্রমাণপত্র সহ আবেদনপত্র ১৯ ডিসেম্বরের মধ্যে পাঠাতে হবে Secretary, Co-operative Service Commission, Bhabani Bhawan (4th floor), Alipore, Kolkata-700027 এই ঠিকানায়। বিস্তারিত জানতে ওয়েবসাইট www.coop.org.&www.benfed.org দেখতে হবে।

শব্দরূপ - ৫৬৫

মঞ্জিতা পাল

■	■	১	২			৩	■
■	■	■		■	■		■
৪	৫	■	৬		৭		
■	৮	৯		■		■	■
■	■		■	১০		১১	■
১২	১৩				■	১৪	
■		■	■		■	■	■
■	১৫					■	■

সূত্র ঃ

পাশাপাশি ঃ ১. বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার, জমদগ্নি-ঋষির পুত্র, ৪. নক্ষত্র সমার্থে দশমহাবিদ্যার অন্যতম, ৬. রামপ্রদাস, বামাক্ষ্যাপা এঁদের যা বলা হয় শক্তিদেবীর পূজারি, ৮. তান্ত্রিক সন্ন্যাসী বিশেষ, ১০. অব্যয়ে অবিকল, যথাযথ, শেষ দুয়ে অনেক, ১২. অন্যনামে দেবীদুর্গা, তিনে-চারে সম্মত, ১৪. শত্রু, ১৫. এ নামেও স্বামীজিকে চেনা যায়, তিনে-চারে কর্ণ।

উপর-নীচ ঃ ২. রোগ মহামারী দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি থেকে পরিত্রাণলাভার্থ এই দেবীর উপাসনা করা হয়, ৩. পূর্ব ভারতীয় প্রাচীন এই দেশ অধুনা বিহারের অন্তর্গত, প্রথম দু'য়ে হাতলযুক্ত পাত্র, ৫. প্রতিপদযুক্ত পূর্ণিমা তিথি, ৭. সম্ভ্রান্ত বা সম্মানিত ব্যক্তি, ৯. কবুতর, ১০. তৎসম শব্দে হোমাগ্নি, ১১. স্বর্গের পরী, ১৩. বংশসূচক নাম।

সমাধান শব্দরূপ - ৫৬৩
সঠিক উত্তরদাতা
শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৭০০০০৯

■	গু	রু	জ	ন	■	■	নী
ছি	পি	■	■	বি	■	■	হা
■	য	■	■	শ	শ	ধ	র
ম	ন্ত্র	ক	■	■	কু	■	■
■	■	লা	■	■	নি	কু	ঞ্জ
গ্র	হ	প	তি	■	■	ম	■
স্থি	■	■	লে	■	■	কু	নো
ক	■	■	ক	ল্প	দ্রু	ম	■

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়। খামের ওপর লিখুন ‘শব্দরূপ’।

● ৫৬৫ সংখ্যার সমাধান আগামী ৩ জানুয়ারি, ২০১১ সংখ্যায়

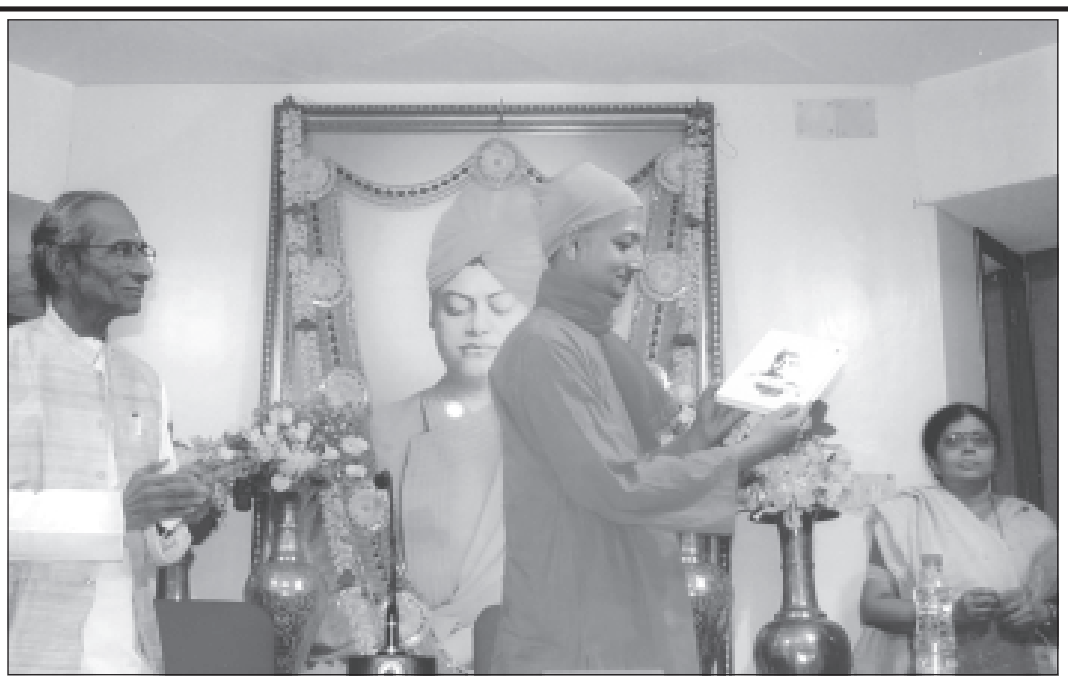

গত ৪ ডিসেম্বর রামকৃষ্ণ মিশন স্বামী বিবেকানন্দ'স অ্যানসিস্ট্রাল হাউস অ্যাণ্ড কালচারাল সেন্টার এবং বিবেকানন্দ পাঠচক্রের যৌথ উদ্যোগে স্বামীজীর পৈতৃক জন্মভিটেয় অনুষ্ঠিত হলো ‘অমিয় কুমার মজুমদার স্মারক বক্তৃতা’। বক্তৃতার বিষয় ছিল অত্যন্ত গুরুগম্ভীর — ‘সর্বভূতে ভগবান - স্বামী বিবেকানন্দ ও বেদান্তের আলোকে’। যদিও তরুণ সন্ন্যাসী স্বামী সর্বপ্রিয়ানন্দের (অধ্যক্ষ,ব্রহ্মচারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বেলুড়) অসামান্য উপস্থাপনায় তা হয়ে ওঠে অনায়াসসাধ্য। ছবিতে প্রয়াত অধ্যাপক মজুমদারের বিভিন্ন সময়ের লেখনী-সমৃদ্ধ প্রবন্ধের একটি পুস্তকের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করছেন মহারাজ। তাঁর ডানদিকে বিবেকানন্দ পাঠচক্রের সভাপতি তুষার কান্তি মজুমদার এবং বাঁদিকে অধ্যাপক মজুমদারের কন্যা ও সমগ্র অনুষ্ঠানটির সঞ্চালিকা অধ্যাপিকা রাইকমল দাশগুপ্ত।

কাউকে পাঠালে হোত না কমরেড ? তারা ওদের ‘পাছা’ দেখাতো

বিশাখা বিশ্বাস

চোখ খুলে যারা দেখতে চেয়েছিল ‘দুর্নীতিমুক্ত সৎ প্রশাসনের’ চেহারা, বেপরোয়া দুর্নীতি ও দুরাচারের অপরিসীম ঔদ্ধত্যে তাদের দিনকে কারা করে দিল রাত— কেন, বামফ্রন্ট! কৃষকের জমি লুটি করে চাষীর রক্ত রঙিন মদের বোতলে ভরে আকণ্ঠ পান করার পর জনগণের শবকে ঠেঙাড়ের হাতে সঁপে দিয়ে কারা দেখাতে চেয়েছিল ‘শিল্প আমাদের ভবিষ্যত’— কেন, বামফ্রন্ট! রবীন্দ্রনাথকে ‘বিশ্বকবি’ বানাবার পর রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বোচ্চ পুলিশকর্তার মুখ দিয়ে (২৫ বোশেখ/০৮) রবীন্দ্রসঙ্গীতকে কারা চেনালো— কেন গো, বামফ্রন্ট!

অবঃপতিত যেসব নেতারা সর্বহারা সমাজের একমাত্র সম্বল ‘সততা’ অপহরণ করে চৌত্রিশটি বছর ধরে গ্রামীণ ধনিক বণিক কুলাক শ্রেণীসহ কংগ্রেসের জোতদার অবশেষের সাথে হাত মিলিয়ে এক নয়া অভিজাত সমাজের পত্তন করেছিল, তারাই সর্বহারা কৃষক সমাজের কাছ থেকে অবশেষে কেড়ে নিয়েছিল বামজমানার প্রথম দশ বছরে প্রাপ্ত নিষ্ফলা জমির পাট্টা, কৃষকের চাষের জমি, কৃষক কুমারীর কৌমার্যের সাথে তার জীবন, নারীর নিরাপত্তা এবং এমনকী বাংলার শিক্ষা-স্বাস্থ্য-সংস্কৃতি। ফসলের মাঠ, নারীর বুক থেকে নজরুল-রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত দীর্ঘ পথের দুপারে তাই রাস্তায় হোর্ডিং : কমরেড পালান, শেকলে বাঁধা রাশিয়ার অপসারিত স্ট্যালিনের মূর্তিটি আপনাদের তাড়া করছে!

লেনিন-স্ট্যালিনের পায়ে এরা এই কমিউনিস্টরাই একদিন দড়ি পরিয়েছিল। নাম ছিল যার মার্ক্সবাদ, দক্ষিণপন্থী সকল শূন্যতার বিরুদ্ধেই ছিল তার সংগ্রামী, কিন্তু নিজে সে ছিল না শূন্য। যে দক্ষিণপন্থার কপালে ছিল মার্ক্সবাদী বিক্ষোভ, ধিক্কার, ঘৃণা, সংগ্রাম— সেই মার্ক্সবাদ-ই এরাজ্যে সেখানেই ফোটালো কমলকলি। দক্ষিণপন্থী সূর্যের বুকে সাতরঙা কামনা সফল হয়ে চলেছে, ঠিকেদার-প্রমোটার-জমিলুটেরা-নারী ধর্ষক হার্মাদিয়া অস্থিরতা আর সুস্থ মানুষের নিরাপত্তার আলোর সব উত্তাপ এখন মিলেমিশে একাকার— কেবল রক্তের তুষারপাতে ফলহীন এই সময়!

তাই, ১৯৬৪ সালে সিপিআই ভেঙে কমরেড মাও-সে-তুঙ-য়ের ছবির নিচে বসে একহাতে শোধনবাদ হটাবার কল্পিত খুঁদি, অন্যহাতে ক্ষমতাদখলের স্বপ্ন নিয়ে সিপিআই-য়ের উদর চিরে ভূমিষ্ঠ হলো কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া উইদিন ব্র্যাকেট ‘এম্’। সেই সিপিএম-ই আজ মাও-সে-তুঙ-কে সাক্ষী রেখে ভাড়াটে কেন্দ্রিয় পুলিশ, নিজস্ব পুলিশবাহিনী, দলীয় ক্যাডার এবং পোষা হার্মাদবাহিনীর আক্রমণে নিহত মানুষের লাস পৈশাচিক উল্লাসে দড়ি বেঁধে বাঁশে ঝুলিয়ে মরা জানোয়ারের মতো নিয়ে যায়— ওরে, কে কোথায় আছিস, দেখবি যদি আয়।

সায়েন্সসিটির ফিস-ফেস্টিভ্যালকে ফিল্মফেস্টিভ্যাল বলে, এ্যাস্ট্রনমিকে এ্যাস্ট্রলজি বলে কাঁধ ঝাঁকিয়ে, ‘দে হ্যাভ বীন পেড ব্যাক বাই দেয়ার ওন কয়েন’-য়ের ‘বী-ভার্ব’টিকেই বর্জন করে, নানা ক্ষেত্রে বক্তৃতায় নানান ভুল উদ্ধৃতি দিয়ে (যেন) ‘বিপ্লব স্পন্দিত’ বুকে লেনিন হয়ে কিশোর কবির যে আত্মীয়টি মায়াকোভস্কির কিছু বাছাই করা শব্দ মুখস্থ করে এ সেই আর এস এস/বিজেপির মাথা ভেঙে সাম্প্রতিক কালে তৃণমূলের স্বপ্ন ভেঙে ‘চুরমার’ করে দেন, সেই তিনি— দীর্ঘ সাড়ে চারটি বছর সনিয়া গান্ধীর পদলেহন পর্বে যিনি মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে একটি কথাও বলেননি— সেই তিনিই আজ মাসখানেক ধরে বলে চলেছেন, মূল্যবৃদ্ধি ঘটছে, কংগ্রেস চুপ, জোট-নেত্রী চুপ! মমতার চালু করা যে ট্রেনে চেপে উত্তরবঙ্গ থেকে দলীয় সমর্থকেরা মধ্যবঙ্গের ক্যাডারেরা যার সভায় যান, সেই তিনিই তৃতীয় শ্রেণীর ক্যারিকেচার করে বলছেন ‘প্রতিদিন ট্রেন বেরুচ্ছে, কোথা থেকে বেরোয় কোথায় যায়’ কেউ জানে না! এন/ডি/এ জমানায় দিল্লীতে আদবানীজীকে প্রণাম করে এসে বাজপেয়ীকে খুশী করতে যিনি বলেছিলেন ‘রাজ্যের মাদ্রাসাগুলিতে সমাজবিরোধী কাজকর্ম চলছে’ এবং তারপরই সংখ্যালঘু সমাজের এক নেতার মাত্র একটি ধমকেই যিনি হয়ে গেলেন একেবারে ‘চুপ’—সকলেই সেইভাবেই তেমনি সময় বুঝেই চুপ করে থাকতে বাধ্য হয়।

তৃণমূলের নেত্রীকেও তাই হয়তো সখেদে বলতেই হয় : ওরে হন্যে তোরে কই/সময় বুঝেই সকল সই।

গ্রামীন সড়ক নির্মাণে প্রতি এক কোটি টাকায় গুজরাটে ষোলটি বিপিএল-পরিবারকে এপিএল-এ উন্নীত করা হয়েছে নির্মাণকর্মের সঙ্গে। প্রধানমন্ত্রী সড়ক-যোজনায় রাজস্থানে ষষ্ঠ পর্যায়ের, মহারাষ্ট্রে সপ্তম পর্যায়ের কাজ চলেছে কেন্দ্রের টাকায়। সেকুলার ‘ডু ইট নাউ’-এর ‘নাই কোথাও’-এর দেশ এই রাজ্যে চলেছে ২য় পর্যায়। প্রতি দশ লক্ষ টাকার বিনিয়োগে পর্যটনশিল্পে কর্মসংস্থান মহারাষ্ট্রে হয়েছে উনসত্তরটি, কৃষিতে পঁয়তাল্লিশ, ম্যানুফ্যাকচারিংয়ে তেতাল্লিশটি—কয়লামাফিয়ার দানের টাকায় হার্মাদ পোষা এই রাজ্যে সেগুলি যথাক্রমে চুয়াল্লিশ, আটত্রিশ এবং তের মাত্র। বসিরহাটে রাজ্য বক্লেন, রাজারহাটে দশ লক্ষ বেকারের কর্মসংস্থান হবে, ব্যারাকপুরে বক্লেন সেখানে দশ লক্ষ লোক বসবাস করবে। দ্যাখো, দ্যাখো কমরেড, নর্মদা থেকে মাতালের তথ্য ধার করে এনে কে যেন কী কয়!

কেরালায় সরকারী বাস পিছু দৈনিক আয় প্রায় সাত হাজার টাকা, বিজেপি শাসিত দূরতম কর্ণাটকেও তা ছয় হাজার চারশ উনপঞ্চাশ টাকা, ভারতের সর্বাধিক সচেতন রাজ্য এই বাংলায় সেটা মাত্র তিন হাজারের সামান্য বেশি (ক্যাগ)। সরকারি পরিবহণ সংস্থার লাভ ২০০৭ সালে মহারাষ্ট্রে সাঁইত্রিশ কোটি এবং অন্ধ্রপ্রদেশে সাড়ে পাঁচ কোটি টাকা, পশ্চিমবাংলায় ক্ষতি ৫১৮ কোটি টাকা (০৪-০৯ সাল পর্যন্ত)। ১৯৩৭-৩৮ সালের মধ্যভাগে আড়াই লক্ষ পোলিশকে খুন করে সেই গ্রাউন্ড্যান্ডসে দাঁড়িয়ে স্ট্যালিন বলেছিলেন সোভিয়েত রাশিয়ার প্রগতির কথা— রক্তস্নাত বাংলার প্রতি গ্রাম থেকে রোজ একজনের মাথা কাটিয়ে (তুলনীয় বিজেপির দুই কর্মীর মাথা কাটাবার ফটোছবি, ১-১২-১০, বর্তমান, পৃঃ ১) এরাজ্যেও ফুসে ফেঁসেস্কুরা করেন শিল্পায়ন/উন্নয়নের গল্প।

পূর্ব-পোল্যান্ড, ইউক্রেন, বেলারুশ এবং বাল্টিক প্রজাতন্ত্রের মাটি খুঁড়ে সোনারূপা খুঁজতে গিয়েছিল মানুষ। মানুষ পেয়েছিল স্ট্যালিন আর হিটলারের হাতে নিহত মানুষের হাঁড়, দাঁত, কঙ্কাল, মাথার চুল এবং লক্ষ লক্ষ অতৃপ্ত মানুষের আত্মার অস্তিত্বে ভারী এক শীতল বাতাস। নানুর, ছোট আঙারিয়া, সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম, জঙ্গলমহল এবং খানাকুলের মাটি যদি আজ খুঁড়তে যায় মানুষ, তাহলে তারাও কী পাবে ভগবান তথাগতের রাজত্বে বধ্যভূমির রক্তস্নানে কাতারে কাতারে জড়ো হওয়া চিল-শকুন আর প্রতিবাদী হাজারো মানুষের ক্রোধ-শোক আর রক্তের নিথর ইতিহাস?

তবু, ‘ওদের এত সাহস যে ওরা রাজারহাটেও যেতে চায়’ (ব্যারাকপুর)?— কমরেড, এক্ষুনি সেখানে মহিলাবাহিনী পাঠালে হয় না, তারা ওদের ‘পাছা’ দেখাতেন?

সায়েন্সসিটির ফিস-ফেস্টিভ্যালকে ফিল্মফেস্টিভ্যাল বলে, এ্যাস্ট্রনমিকে এ্যাস্ট্রলজি বলে কাঁধ ঝাঁকিয়ে, ‘দে হ্যাভ বীন পেড ব্যাক বাই দেয়ার ওন কয়েন’-য়ের ‘বী-ভার্ব’টিকেই বর্জন করে, নানা ক্ষেত্রে বক্তৃতায় নানান ভুল উদ্ধৃতি দিয়ে (যেন) ‘বিপ্লব স্পন্দিত’ বুকে লেনিন হয়ে কিশোর কবির যে আত্মীয়টি মায়াকোভস্কির কিছু বাছাই করা শব্দ মুখস্থ করে এ সেই আর এস এস/বিজেপির মাথা ভেঙে সাম্প্রতিক কালে তৃণমূলের স্বপ্ন ভেঙে ‘চুরমার’ করে দেন, সেই তিনি— দীর্ঘ সাড়ে চারটি বছর সনিয়া গান্ধীর পদলেহন পর্বে যিনি মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে একটি কথাও বলেননি— সেই তিনিই আজ মাসখানেক ধরে বলে চলেছেন, মূল্যবৃদ্ধি ঘটছে, কংগ্রেস চুপ, জোট-নেত্রী চুপ!

আর এস এস নয়, কংগ্রেসকেই খতম করতে হবে

শিবাজী গুপ্ত

ভারত আক্রান্ত, ভারতীয়ত্ব আক্রান্ত, ভারতে হিন্দুরা আক্রান্ত চারদিক থেকে। তারা মশামাছির মতো মারা পড়ছে। শত্রুকে সম্মুখ যুদ্ধে রোখা যায়। দু'দিক থেকে আক্রমণ হলে আর আক্রান্ত ব্যক্তি যদি সব্যসাচী হন তবে দু'হাতে আক্রমণ ঠেকানো যায়, যদি প্রতিরোধকারী সৈন্যবল অর্থবলের সঙ্গে চরিত্রবলে বলীয়ান হয়। আমাদের শাসকগোষ্ঠী সৈন্যবল অর্থবলে বলীয়ান হলেও চরিত্রবল হারিয়েছে স্বাধীনতার জন্মলগ্ন থেকেই। তাই আমরা সার্বিক অধঃপতনের শেষ সীমায় পৌঁছেছি।

সাধক কবি রামপ্রসাদ গেয়েছেন— ‘দোষ কারও নয় গো মা, স্বখাতসলিলে ডুবে মরি শ্যামা।’ আমাদের শাসক গোষ্ঠী স্বখাত সলিলে ডুবছে। সেইসঙ্গে দেশবাসীকেও ডোবাচ্ছে। তা না হলে আজ কাশ্মীর নিয়ে নাকানিচোবানি খেতে হতো কি? সঙ্কটাবর্তে ভারতের অস্তিত্ব আজ বিপন্ন। জাত শত্রু এবং মিত্রবেশী শত্রু তার ঘরে বাইরে। একটা ভয়ঙ্কর বিপর্যয় তাকে গ্রাস করতে উদ্যত। কাণ্ডজ্ঞানহীন দিবাজ্ঞানে স্থিতপ্রজ্ঞ ভারতের জাতীয় ও বিজাতীয় নেতৃত্ব তুরীয়ানন্দ বিভোর দেশবাসী অসহায় কিংকর্তব্যবিমূঢ়, বিভ্রান্ত। কারণ, অতীত ইতিহাস ও তার প্রকৃত এবং নায়কদের বিদ্রূত চরিত্র সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতা ও অনীহা।

মাথায় সর্পাঘাত হলে তাগা বাঁধার জায়গা থাকে না। ভারতের শির কাশ্মীরে ইসলামী সর্পাঘাত চলছে অনবরত। গত কয়েক মাস ধরে কাশ্মীর বিচ্ছিন্নতাবাদীদের হিংসাত্মক আগুনে জ্বলছে। জেহাদের নামে মৌলবাদীরা সাধারণ মানুষকে খেপিয়ে পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর ওপর হামলা চালাচ্ছে। সরকারি সম্পত্তি ধ্বংস করছে নির্বিচারে। ভারতের পতাকা পোড়ানো হচ্ছে। মসজিদ মাজারের আড়ালে থেকে পাকিস্তান জিন্দাবাদ, ভারত মুর্দাবাদ ধ্বনি দিচ্ছে। বন্দুক-বোমা-পিস্তল-রাইফেল ও পাথরের ঘায়ে ঘায়েল করছে পুলিশ মিলিটারিকে। কিন্তু তারা নিরুপায়, কারণ নপুংশক ভারত সরকারের কড়া নির্দেশ— মসজিদের ভেতরে ঢোকা যাবে না। মসজিদের পবিত্রতা নষ্ট হবে। যে মসজিদ চোর-ডাকাত-ছিনতাইবাজ-লম্পট-লোচ্চা-খুনীর আশ্রয়স্থল, তার আবার কিসের পবিত্রতা! দেশদ্রোহী সমাজদ্রোহীদের আশ্রয়স্থল এসব ইঁটের পাঁজা গুঁড়িয়ে দিলে কি আসে যায়? পাকিস্তান-আফগানিস্তান-ইরাক-ইরানে যে বোমা রকেটের আঘাতে শত শত মসজিদ গুঁড়িয়ে যাচ্ছে, তাতে আল্লার গায়ে ফোস্কা পড়েছে বলে তো শুনিনি। ফোস্কা পড়লে নিশ্চয়ই ভারতের সেকুলার সারমেয়র দল মনমোহন-সোনিয়া সমেত, বোরোলীন-বার্নল নিয়ে ছুটে যেত। মানব ইতিহাসে আদিম নগ্ন হিংসায়, পৈশাচিক বর্বরতায় যে আনন্দ উল্লাস মুসলিম সমাজের একাংশের মধ্যে দেখা যায়, সেইসব সামাজিক জঞ্জালকে সমাজদেহ থেকে নিশ্চিহ্ন করে সমাজকে ভদ্রলোকের বাসস্থানে পরিণত করতে সোনিয়া-মনমোহনের এতো দ্বিধা কেন? মনে হয়, নিহত জোওয়ানগুলি প্রায় সবই হিন্দু মা-বাবার সন্তান বলেই এদের মৃত্যুতে খৃস্টান সোনিয়ার মনে কোনও দাগ কাটে না।

উল্টে খৃস্টানের বেটা খৃস্টান রাহুল গান্ধীকে মাঠে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, কপালে সিন্দুর লেপে নিজেকে নৈষ্ঠিক হিন্দু ভাঁওতা দিয়ে মানুষের মন জয় করতে। তার বাপের বয়সের বেশি যে প্রতিষ্ঠানের বয়স, সেই আর এস এস-কে এই ছোঁড়া সন্ত্রাসী ও জেহাদিদের আশ্রয়স্থল, মুসলিম সন্ত্রাসবাদের মূল কেন্দ্র, সিমি-র সঙ্গে একসূত্রে গেঁথে নিষিদ্ধ করার দাবি তুলেছে। নাতি হয়ে হাতির সঙ্গে পাল্লা দিতে চায়! ঔদ্ধত্যের একটা সীমা থাকা উচিত।

এর মাতামহ জওহরলাল নেহরু। গান্ধী যদি জাতির জনক হন, তাহলে জওহরলাল জাতির দুর্ভাগ্যের জনক। জওহর শব্দের অর্থ মূল্যবান মণিরত্ন, আবার প্রাণঘাতী বিষও বটে। ভারতের দুর্ভাগ্যক্রমে জওহর বিষ রূপে হিন্দু হিন্দুস্থান ও হিন্দু ধর্মের বিনাশের পথ পরিষ্কার করে গেছে। মোগলদের উচ্ছিষ্টপুষ্ট এবং কাশ্মীর থেকে আগত ফুলে ফুলে মধুপায়ী নন্দলালরূপী জওহরলালস্খলিত চরিত্র ভারতবাসীর দুর্ভাগ্যের মূল কারণ। যে ব্যক্তি বুক ফুলিয়ে বলতে পারে, ‘আমি শিক্ষায় ইংরেজ, সংস্কৃতিতে মুসলমান আর দুর্ঘটনাবশত হিন্দু’— তার কাছে ভারত একটি মাটির দেশ মাত্র। মাতৃসমা মাতৃভূমি না। তার অঙ্গচ্ছেদে নেহরুর অন্তরে বেদনাবোধ না হওয়াই স্বাভাবিক। এর দাম্ভিকতা ও ক্ষমতালিপ্সার সুযোগ নিয়ে, দেশবাসীকে দেশভাগের পরিণতি সম্পর্কে ভালোভাবে অবহিত না করে, তড়িঘড়ি দেশভাগ মেনে নিলেন। আর আড়াই কোটি হিন্দু-শিখকে পথে বসিয়ে নিজে মাউন্টব্যাটেনের হাত ধরে ও লেডি মাউন্টব্যাটেনের আশিস নিয়ে গদিতে বসে পড়লেন। হিন্দু-শিখের তপ্ত রক্তে সিক্ত তখতে বসতে তার তিলমাত্র দ্বিধাসঙ্কোচ হয়নি।

এই নেহরু বংশের হিন্দু বিদ্বেষ সুবিদিত। এরা হিন্দু দেবদেবী মানে না, হিন্দু মন্দিরে মাথা নোয়ায় না, শিখ স্বর্ণমন্দির আক্রমণ ও ক্ষতিগ্রস্ত করতে এদের তিলমাত্র দ্বিধা হয় না। কিন্তু মুসলিম মসজিদ মাজারে গিয়ে লুটোপুটি খায়। এদের প্রশ্রয়েই মুসলিম সন্ত্রাসী জেহাদিরা অক্ষরধাম মন্দির আক্রমণ করতে সাহস পায়। অমরনাথ যাত্রীদের ওপর হামলা চালাতে সাহস পায়। কারণ, তারা জানে, তাদের আশ্রয় ও প্রশ্রয়দাতা কংগ্রেসীরাই ক্ষমতাসীন, তারা কখনোই মুসলিম সন্ত্রাসীর গায়ে হাত দেবে না।

উল্টে রাজ্যে রাজ্যে আর এস এস অফিসে হামলা চালানো হচ্ছে। আর এস এসকে সিমির সমগোত্র বলে মিথ্যা প্রচার চালিয়ে তাকে নিষিদ্ধ করার দাবি তোলা হচ্ছে। যেহেতু প্রাক্তন আর এস এস প্রধান সুদর্শনজী এই নেহরু-গান্ধী পরিবারের গোপন ইতিহাস হাটে হাঁড়ি ভেঙে প্রচার করে দিয়েছেন। চেপে রাখা মিথ্যার আবরণ উন্মোচন করেছেন। গায়ে জ্বালা লাগা তো স্বাভাবিক। আর এস এস ভারতীয় শিক্ষা সংস্কৃতি, ধর্ম, ঐতিহ্য সম্পর্কে শ্রদ্ধাবান, আর মুসলমান ও খৃস্টান পদাশ্রিত কংগ্রেসীদের কাছে চক্ষুশূল স্বরূপ।

কংগ্রেসীরা আর এস এসকে খতম করার ডাক দিয়েছে। আমরা দেশবাসীকে আহ্বান করে বলছি— আসুন, আমরা দেশ ও জাতির সর্বনাশের শনিঠাকুর কংগ্রেসকে খতম করার শপথ নিই।

Ori Plast

P.V.C. Threaded Pipes. For deep Tubewell & general sanitation. Substitutes to conventionnal G.I. Pipes

Authrorised Distributor :

NATIONAL PIPE & SANITERY STORES

54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831, 2210-5833
15, College Street, Kolkata-700012 Ph : 2241-7149 / 8174

PARTHA SARATHI CERAMICS

4, College St. Kalkata-700012. Ph. :2241-6413/5986

Swastika
20 December - 2010, Rs. 4.00 only

Registration No. Kol. RMS / 048/2010 -2012
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
RNI No.5257/57 License No. MM&P.O. / SSRM-Kol. RMS/ RNP-048/LPWP-028/2010 -12

দক্ষিণেশ্বর মন্দির চত্বরে বিশাল হিন্দু সম্মেলন

'গৈরিক সন্ত্রাস' শব্দটি দেশবাসীকে অপমানের নামান্তর : তোগাড়িয়া

কৃশানু মিত্র।। যে গৈরিক বসন দেখে এদেশের আপামর জনসাধারণের মনে আবহমানকাল ধরে শ্রদ্ধা-সম্মানের ভাব জেগেছে, আজ সেই গৈরিক শব্দকে সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে জুড়ে দেওয়াটা প্রকারান্তরে দেশবাসীকে অপমান করা। এদেশের জাতীয় স্বাভিমান বা অস্মিতাকে নষ্ট করার চক্রান্ত। এই কাজ শুধুমাত্র ভোটের লালসায় মুষ্টিমেয় মুসলিম উগ্রবাদীদের তুষ্ট করার জন্য সোনিয়া গান্ধীর নির্দেশে করা হচ্ছে বলে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের আন্তর্জাতিক সম্পাদক প্রবীণভাই তোগাড়িয়া। গত ১১ ডিসেম্বর হনুমৎ শক্তি জাগরণ সমিতির উদ্যোগে আয়োজিত দক্ষিণেশ্বরস্থিত ভবতারিণীর মন্দির চত্বরে অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় বক্তব্য রাখতে এসে তিনি এই মন্তব্য করেন। অযোধ্যায় রামজন্মভূমিতে প্রস্তাবিত রামমন্দির গড়ে তুলতে এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে হনুমৎ শক্তি জাগরণ সমিতির উদ্যোগে সর্বভারতীয় কার্যক্রমের অঙ্গ হিসাবে ওইদিন কলকাতার উপকণ্ঠে রাণী রাসমণির স্মৃতি-বিজড়িত এবং ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের লীলাধন্য দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে হনুমৎ শক্তি জাগরণের কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। অযোধ্যার করসেবকপুরমে গত ২০ অক্টোবর হিন্দু সাধু-সন্তদের নিয়ে গঠিত উচ্চ-ক্ষমতা সম্পন্ন কমিটি 'সন্ত উচ্চাধিকার সমিতি'র গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। আগামী একমাস ধরে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে এধরনের কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হবে। শ্রী তোগাড়িয়া আরও বলেন, রামমন্দির রামজন্মস্থানেই হবে। এটা আদালত কর্তৃক সিদ্ধান্তই শুধু নয়, দেশবাসীর চিরন্তন বিশ্বাসের আধারে প্রতিষ্ঠিত। এই সিদ্ধান্তকে কার্যকরী করতেই দেশের সাধু-সন্ত ও মহাত্মাগণ সম্মিলিত ভাবে হরিদ্বার কুম্ভ মেলায় যে সিদ্ধান্ত নেয়, সে অনুসারেই সারা দেশজুড়ে এই ধরনের হিন্দু-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

অনুষ্ঠানের দিন সকাল থেকেই দক্ষিণেশ্বর চত্বর উৎসবমুখর হয়ে ওঠে হাজার হাজার মানুষের ভীড়ে। কে নেই তাতে? আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা উন্মুখ হয়ে ছিলেন এদিনের অনুষ্ঠানটির জন্য। কেউ পুজো দেন, কেউ বা সকালের মনোরম পরিবেশে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের পাশ দিয়ে প্রবাহিত স্রোতস্বিনী গঙ্গার সৌন্দর্য্য উপভোগ করেন। বিভিন্ন হিন্দু মিশন ও সংগঠনের সাধুসন্তগণ এই অনুষ্ঠানে

মঞ্চে প্রবীণভাই তোগাড়িয়ার সঙ্গে অন্যান্যরা।

সম্মেলনে জনতার ঢল।

অংশগ্রহণ করেন। এদিন সকাল সাড়ে ন'টা নাগাদ মঙ্গলাচারণের মাধ্যমে ধর্মসভা শুরু হয়। শুরুতে হনুমান চালিশা পাঠ, ভক্তিগীতি ইত্যাদির পর একে একে সন্তগণ বক্তব্য রাখেন। সকলেই রামমন্দির নির্মাণের ওপর জোর দেন।

অনুষ্ঠানে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের আন্তর্জাতিক সাধারণ সম্পাদক প্রবীণভাই তোগাড়িয়া ছাড়াও বক্তব্য রাখেন স্বামী বন্ধুগৌরব মহারাজ, আর এস এসের পূর্ব-ক্ষেত্র সঙ্ঘচালক রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রিষড়া প্রেমমন্দিরের অধ্যক্ষ তথা অনুষ্ঠানের সভাপতি শ্রীমৎ দেবানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ। আর্য সমাজের পক্ষ থেকে সর্বভারতীয় কার্যকরী সভাপতি আনন্দ কুমার আর্য বলেন, রামমন্দির নির্মাণ ভারতের একাত্মতার প্রতীক। এটা অবশ্যই হওয়া উচিত। আর্য সমাজ রামমন্দির নির্মাণের পক্ষে চিরকাল সওয়াল করে এসেছে, আজও সঙ্গে আছে।

সঙ্ঘের পূর্ব-ক্ষেত্র সঙ্ঘচালক রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন— শুধু রামমন্দির নির্মাণই নয়, কাশী, মথুরাতেও মন্দির নির্মাণ করতে হবে, দেশব্যাপী যে হনুমৎ শক্তি জাগরণ অনুষ্ঠান হচ্ছে তাতে আগামীদিনে রামমন্দির নির্মাণের পাশাপাশি কাশী মথুরাসহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে আরও মঠ-মন্দিরের তৈরির পথ প্রশস্ত হবে বলে তিনি দাবি করেন।

এ ব্যাপারে দেশের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গেও যোগাযোগ রেখে তাদের মধ্যেও জাতীয় স্বার্থে রামমন্দির নির্মাণের প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে জাগরণের কাজ হয়ে চলেছে বলে জানান বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম সম্পাদক ডাঃ চিন্ময় পন্ত। সভাপতির ভাষণে রিষড়া প্রেমমন্দিরের প্রবীণ সন্ন্যাসী শ্রীমৎ দেবানন্দ ব্রহ্মচারী সকলকে সমবেতভাবে রামমন্দির নির্মাণের ব্যাপারে এগিয়ে আসার আবেদন জানান। অনুষ্ঠানের মুখ্য বক্তা ডাঃ প্রবীণভাই তোগাড়িয়া সকলকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, "হিন্দু অস্মিতা ঘোষণা করছে যে হিন্দুরা আর রামমন্দিরের নির্মাণের জন্য ভিক্ষা এবং আবেদন-নিবেদন করবে না। হিন্দুরা বদ্ধ প্রতিজ্ঞ যে রামজন্মভূমিতে তারা রামমন্দির নির্মাণ করবেই।" আফজল গুরুর মতো সন্ত্রাসবাদীকে ফাঁসিতে না ঝুলিয়ে কেন্দ্র সরকারের প্রত্যক্ষ মদতে যেভাবে স্বামী অসীমানন্দের মতো হিন্দু সন্ত এবং সমাজ-সেবীদের অসম্মানিত হতে হচ্ছে, সে ব্যাপারে ইউ পি এ সরকারকে হুঁশিয়ারীও দেন তিনি। তিনি বলেন, স্বাধীনতা-পূর্ব ভারতে মুসলীম লিগ ও সুরাবর্দী যে ভারত ও হিন্দু-বিরোধী অবস্থান নিয়ে ছিল আজকে সেই ভূমিকাতেই কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট দলগুলোকে দেখা যাচ্ছে।

ভিন্ন প্রেক্ষিতে প্রবীণ তোগাড়িয়া জানান, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ গো-রক্ষা ও গো-প্রজননের দায়িত্ব নিয়েছে। গড়ে তোলা হয়েছে, ২০০-রও বেশি গোশালা। পরিবেশ-বান্ধব এবং কম দামী সাবান-শ্যাম্পু, ফেয়ারনেস ক্রীম ও অন্যান্য প্রসাধন তৈরিতে গো-মূত্র এবং গোবরের উপযোগিতার কথা স্মরণ করিয়ে দেন তিনি।

হরহর মহাদেব, জয় শ্রীরাম ধ্বনিতে মাতোয়ারা অন্তত হাজার দশেক হিন্দু-জনতার উপস্থিতিতে দক্ষিণেশ্বর মন্দির চত্বরেই ওইদিন ঘোষিত হলো রাম-মন্দির নির্মাণের উদ্যোগ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন শ্রীমৎ বন্ধুগৌরব ব্রহ্মচারী।

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩ কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।
সম্পাদক : বিজয় আঢ্য, সহ সম্পাদক : বাসুদেব পাল ও নবকুমার ভট্টাচার্য। দূরভাষ : সম্পাদকীয় - ৯৮৭৪০৮০৩৪৩, অফিস - ৯৮৭৪০৮০৩৪৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১, বিজ্ঞাপন - ৯৮৭৪০৮০৩৪২, ২২৪১-০৪০৩, টেলিফ্যাক্স : ২২৪১-৫৯১৫,
e-mail : swastika5915@gmail.com / vijoy.adya@gmail.com, website : www.eswastika.com